Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জুন ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ জুন ২০০৯ ইং ৯ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

১. টিপাইমুখ বাঁধ : আরেকটি ফারাক্কা

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে খ্যাত যে ভারতের ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র পীড়িত। যার মধ্যে প্রায় ১১ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সেই ভারতের মানুষের একটা অংশ জোঁকের মত গরীবের রক্ত শোষণ করে পুঁজিবাদী আমেরিকা-ইংল্যান্ডকে ডিঙিয়ে এখন বিশ্বের সেরা ধনী হিসাবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে। সেই সাথে টাকার চাকতি আর মিথ্যা আশ্বাসের জালে আটকিয়ে গরীবের ভোট নিয়ে ঐসব পুঁজিবাদী শোষকরা নিজেরা বা নিজেদের অনুগতদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে নিজ রাষ্ট্রের বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের যেখানেই তাদের পুঁজির স্বার্থ দেখতে পায় সেখানেই তারা হামলে পড়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজির পাহাড় গড়ার জন্য। আর সেজন্য তারা তৈরী করে নানাবিধ প্রতারণার কৌশল। ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশী হামলাকারীদের লোভনীয় ভূমি হিসাবে পরিচিত। আর সবসময় তাদের সহযোগিতায় ছিল দেশীয় দালাল শ্রেণী। যারা বিদেশীদের দেওয়া জমিদার, নওয়াব, স্যার, নাইট ইত্যাদি লকবের তকমা এঁটে নিজ দেশীয় লোকদের উপর যুলুম করত ও তাদের রক্ত শোষণ করত। '৪৭-এর স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী শোষকরা শাসনক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে দেশীয় শোষকরা ক্ষমতায় বসে দু'হাতে লুটেপুটে খেতে শুরু করে। বিদেশীরা যে শাসননীতি এদেশে রেখে যায়, তাতে শোষকদের ক্ষমতা লাভের সুন্দর সুযোগ থাকায় দেশীয় দালাল শাসকরা তার কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। ফলে স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ৬১ বছর যাবত ভারত বর্ষের কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বৃটিশের রেখে যাওয়া শোষণমূলক রাজনীতি ও অর্থনীতির পায়রবী করে চলেছে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে। আর সেকারণেই 'গরীবী হটাও' শ্লোগান দিয়ে 'গরীবী বাড়াও'-এর প্রতিযোগিতা চলছে দেশীয় প্রভুদের হাতেই।

পুঁজিবাদীদের নযর সর্বদা ভারতবর্ষের সর্বত্র সার্চ লাইটের আলোর মত ঘুরতে থাকে। শকুন যেমন আকাশে উঠেও মাটিতে নযর থাকে কোথায় একটা মড়া পাওয়া যায়, এইসব শোষকরা সর্বদা তাকিয়ে থাকে কোথায় গিয়ে শোষণের সুযোগ পাওয়া যায়। ফেরাউন-হামান ও কারূণের গোষ্ঠী এইসব শোষকদের নযর থাকে সর্বদা ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার প্রভৃতি

এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহের দিকে। চাই তা মাটির উপরে হৌক বা পানির নীচে ভূতলে হৌক।

প্রতিবেশী শকুনীরা এবার বিদেশী আন্তর্জাতিক শকুনদের সাথে মিলে উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমালয় ও বরাক অববাহিকা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুবিধা ব্যবহার করে পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ হাযার মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল এক মুনাফা বাণিজ্যের আয়োজন করে চলেছে। যা ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশকে চূড়ান্ত ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেবে।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারত থেকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা প্রধান তিনটি নদী গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা চাপাই নবাবগঞ্জে পদ্মা হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। যার বিপরীতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় ভারত বাঁধ চালু করেছে ১৯৭৫ সালের ২১শে এপ্রিলে। এর ফলে রাজশাহী-খুলনা সহ উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যেলাগুলি মরুভূমিতে পরিণত হবে। সুন্দরবন শেষ হয়ে যাবে। **দ্বিতীয়ঃ** ব্রহ্মপুত্র নদী। যা কুড়িগ্রাম দিয়ে ঢুকে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ইত্যাদি নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর বিপরীতে ভারত ৩০টি সংযোগ খাল খনন করে ৩৭টি শাখা নদী সহ অন্যান্য নদীর মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প স্থাপন করে সব পানি উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি উজানের রাজ্যগুলিতে টেনে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গ মরুভূমি হ'তে চলেছে। এই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হবে ২০১৬ সালে। **তৃতীয়ঃ** মেঘনা নদী। যা বরাক নদী নামে মণিপুর রাজ্য থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে সুরমা-কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করে অতঃপর মেঘনা নাম নিয়ে চাঁদপুরের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ছোট-বড় অন্যূন ২৩০টি নদীর প্রায় সবগুলি এ তিনটির সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। এগুলির মধ্যে উপরোক্ত বড় তিনটি সহ মোট ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং আরও ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। এভাবে সর্বমোট ৫৭টি নদী হ'ল আন্তর্জাতিক নদী। যার মধ্যে কেবল গঙ্গা নদীর ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা চুক্তি আছে কাগজে-কলমে নামকাওয়াস্তে। বাকীগুলির ব্যাপারে ভারত বা মায়ানমার কারু সাথে বাংলাদেশের কোন চুক্তি নেই। বাংলাদেশ ভাটিতে হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে ভারত। সবক'টির উজানে সে বাঁধ দিয়েছে কথিত পানি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে। যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হ'ল, গঙ্গায় ফারাক্কা (পশ্চিমবঙ্গ), তিস্তায় গজলডোবা (জলপাইগুড়ি), ব্রহ্মপুত্রে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বরাকে টিপাইমুখ বাঁধ (মণিপুর)। বাঁধ সন্নিহিত ভারতীয় এলাকা সমূহ মজে উঠেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় এলাকা ও বাংলাদেশ এখন ডুবছে ও শুকাচ্ছে ও নাকানি-চুবানি খাচ্ছে।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদীতে পানির স্রোত ও চাপ কমে যাওয়ায় স্থলভাগে সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ ঘটছে। ফলে মিঠাপানির উৎস শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচ থেকে পানির সাথে আর্সেনিক বিষ উপরে উঠে আসছে। ফসল ও মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হ'তে চলেছে। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের প্রাণবৈচিত্র শেষ হ'তে চলেছে। ভারতের এই প্রতিবেশগত আগ্রাসন অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে তেমনি মণিপুর রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিজ দেশের ক্ষতি করেও তারা এ আত্মঘাতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জনগণের কল্যাণের নামে গুটিকয়েক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মুনাফাখোর পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর কপট স্বার্থ হাছিলের জন্য। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি পুঁজিবাদের বিশ্বমোড়লরা এসব প্রকল্পে অর্থ যোগান দিচ্ছে। যেমন ইতিপূর্বে ফারাক্কা বাঁধের সময় তারা দিয়েছিল। এর মধ্যে উভয় দেশের ভোটদাতা কোটি কোটি জনগণের কোন মঙ্গল নেই। আছে কেবলি ক্ষতি, বঞ্চনা আর সাক্ষাৎ ধ্বংসের যন্ত্রণা। নির্যাতিত মানবতা জেগে উঠবে কী?

সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা দু'দেশের জন্য অপেক্ষা করছে, সেটা হ'ল ধ্বংসকারী ভূমিকম্প। যেসব বাঁধ তারা দিয়েছেন, তার ফলে নদীর স্রোত বাধাগ্রস্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে যে বিশাল বিশাল জলাধার সৃষ্টি হয়েছে, তার চাপে ভূতলের শিলাস্তরের উপর যে অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি হয়, তাতে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেড়ে যায়। জলাধার প্রভাবিত ভূমিকম্পের বিষয়টি প্রথম নযরে আসে ১৯৩২ সালে আলজেরিয়ার কুয়েড বাড্ডা বাঁধের ক্ষেত্রে। আর এযাবতকালে বিশ্বের সবচেয়ে তীব্র মাত্রার জলাধার প্রভাবিত ভূমিকম্প হয়েছে খোদ ভারতের মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধের কারণে ১৯৬৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে। ৬.৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি তার কেন্দ্র থেকে ২৩০ কিঃমিঃ দূরেও তীব্র আঘাত হেনেছিল।

এসব জেনেশুনেও ভারত তার নিজ রাজ্য মণিপুরের যে স্থানে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে, সেটি হ'ল পৃথিবীর ৬টি ভয়ংকর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে একটি। বাকী পাঁচটি হ'ল আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, জাপান, তুরস্ক ও তাইওয়ান। টিপাইমুখ বাঁধের ১০০ থেকে ২০০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে ১০০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে ৫ মাত্রা বা তার বেশী মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে ১০০টিরও বেশী এবং ৭-এর বেশী মাত্রার হয়েছে দু'টি। তার মধ্যে একটিতো হয়েছে গত ১৯৫৭ সালে টিপাইমুখ থেকে মাত্র ৭৫ কিঃমিঃ দূরে। ভারত ও মায়ানমারের টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের জন্য এলাকাটি দুনিয়ার অন্যতম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। কাজেই এরকম একটি এলাকায় ১৬৮.২ মিটার উচ্চতার একটি জলাধার নির্মাণ করা মানে বাংলাদেশ ও ভারতের পুরা এলাকার জন্য সেধে ঘন ঘন ভূমিকম্প ডেকে আনা। আর তাতে উভয় দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতার মুখে ভারত বাঁধ নির্মাণ করতে বা চালু করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশী শাসকদের নতজানু নীতির কারণে তারা একে একে বাঁধ দিয়েই চলেছে। টিপাইমুখ এখন সর্বশেষ বাঁধ, যার ভিত্তি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর এবং যা শেষ হবে ২০১১ সালে। এখন উভয় দেশের সচেতন জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেতনাই পারে দেশী ও বিদেশী শোষকদের পরিকল্পিত শোষণ ও ধ্বংসের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে। মনে রাখতে হবে যে, নদী আল্লাহ্‌র দান। এটা কোন রাজা-মহারাজা বা সরকার প্রধানের দান-অনুদান নয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বায়ুর প্রবাহ ভোগের অধিকার যেমন সবার জন্য সমান, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নদীর পানি ভোগের অধিকার তেমনি সকলের জন্য সমান। তাই যেকোন মূল্যে আন্তর্জাতিক নদীগুলির স্রোত অব্যাহত রাখতে হবে। দেহের শিরা-উপশিরায় ব্লক হ'লে যেমন রক্তের স্রোত বন্ধ হয় ও তাতে চাপ সৃষ্টি হয়ে মানুষ মারা যায়, নদীতে বাঁধ দিলে তেমনি পানির স্রোত বন্ধ হয়ে পানির উত্থান-পতনে দেশ ধ্বংস হয়। তাই রাষ্ট্রের সীমানা দিয়ে পানির সীমানা বেঁধে দেওয়া যাবে না। এখানে-ওখানে বাঁধ দিয়ে নদী-মহানদীগুলিকে হ্রদ ও পুকুরে পরিণত করা যাবে না। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে এই অন্যায় ও অমানবিক ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকের শানিত উত্থান চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

২. আইলার আঘাতে লণ্ডভণ্ড খুলনা উপকূল

সাগর কন্যা শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ এলাকার ভাষা অনুযায়ী 'আইলা' অর্থ শুশুক, যা নদী বা সাগরের বুক চিরে হঠাৎ ওঠে আর ডোবে। ২০০৭ সালে ও ২০০৮ সালে রাত্রিতে সিডর ও নার্গিসের আঘাতের পর কয়েকমাস যেতে না যেতেই গত ২৫শে মে '০৯ দুপুর বেলায় এলো আইলার আঘাত। আইলা এসেছে খানিকটা লুকিয়ে অমাবশ্যার সাথে ১০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস নিয়ে। তেমন কোন হৈচৈ না ফেলে ক্ষতি করে গেছে প্রচুর, যা সিডর-নার্গিসকেও হার মানিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সাতক্ষীরার আশাশুনি, শ্যামনগর ও খুলনার কয়রা ও দাকোপ উপযেলা ছিল আইলার প্রধান টার্গেট ভূমি। অথচ এ অঞ্চলের মানুষ সর্বদা এসব থেকে নিরাপদ থাকে প্রধানতঃ সুন্দরবনের কারণে, যা সকল প্রকার সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে এ অঞ্চলকে দেওয়ালের মত হেফাযত করে। কিন্তু লোভী মানুষের অত্যাচারে সুন্দরবন ক্রমেই বৃক্ষশূন্য হ'তে চলেছে। ফলে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছি। **প্রশ্ন হ'লঃ** এসব কি কেবলই প্রাকৃতিক দুর্যোগ? মোটেই নয়। প্রকৃতির স্রষ্টা যিনি, এসব তাঁরই ক্রোধের কষাঘাত। যাতে বান্দা সাবধান হয় এবং সৎকর্মশীল হয়ে জগতসংসারের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাসী হ'ত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর প্রবৃদ্ধিসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে আমরা তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে' (৯৬)। 'জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমাদের আযাব তাদের উপর এসে পড়বে রাতের বেলায় যখন তারা ঘুমে নিমগ্ন' (৯৭)। 'আর জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমাদের আযাব তাদের উপর এসে পড়বে দিনের বেলায় যখন তারা খেলা-ধূলায় মত্ত' (৯৮)। 'তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় কেবল তারাই, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে' *(আ'রাফ ৯৬-৯৯)*। অতএব হে মানুষ আল্লাহভীরু হও!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৯ম কিস্তি)

আহলে মাদইয়ানের উপরে আপতিত গযবের বিবরণ

হযরত শো‘আয়েব (আঃ)-এর শত উপদেশ উপেক্ষা করে যখন কওমের নেতারা তাদের অন্যায় কর্মসমূহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনড় রইল এবং নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেবার ও হত্যা করার হুমকি দিল ও সর্বোপরি হঠকারিতা করে তারা আল্লাহ্র গযব প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করলেন এবং কওমের নেতাদের বললেন, وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ‘(ঠিক আছে), তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম’ *(হূদ ১১/৯৩)*।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী শো‘আয়েব (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হ’তে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন। অতঃপর জিবরীলের এক গগণবিদারী নিনাদে অবাধ্য কওমের সকলে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ- كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ-

‘অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো‘আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট নিনাদ আপতিত হ’ল। ফলে ভোর না হ’তেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল’। ‘(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ’ল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদ জাতির উপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত’ *(হূদ ১১/৯৪-৯৫)*। যদিও তারা দুনিয়াতে মযবুত ও নিরাপদ অট্টালিকায় বসবাস করত।

আছহাবে মাদইয়ানের উপরে গযবের ব্যাপারে কুরআনে رَجْفَةٌ، صَيْحَةٌ، ظُلَّةٌ. তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ভূগর্ভস্থ কক্ষে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে আরও গরম অনুভূত হয়। তখন তারা জঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা সেখানে একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের সমস্ত লোক উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ আকাশ থেকে ভীষণ নিনাদ এল। নীচের দিকে ভূমিকম্প শুরু হ’ল এবং মেঘমালা হ’তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। এভাবে কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব ধ্বংসস্থল নযরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ، ‘এসব জনপদ ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় আবাদ হয়নি অল্প কয়েকটি ব্যতীত। অবশেষে আমরাই এ সবের মালিক রয়েছি’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৮)*। তিনি বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ، ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে’ *(হিজর ১৫/৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করতেন, তখন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন ও সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে স্থান অতিক্রম করতেন।[১০৭] অথচ এখনকার যুগের বস্তুবাদী লোকেরা এসব স্থানকে শিক্ষাস্থল না বানিয়ে পর্যটন কেন্দ্রের নামে তামাশার স্থলে পরিণত করেছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত শো‘আয়েব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা আ‘রাফ ৮৫-৯৩=৯; তওবাহ ৭০; হূদ ৮৪-৯৫=১২; হিজর ৭৮-৭৯; হজ্জ ৪৪; শো‘আরা ১৭৬-১৯১=১৬; ক্বাছাছ ২৩-২৮=৬; আনকাবূত ৩৬-৩৭; ছোয়াদ ১৩-১৫=৩; ক্বাফ ১৪।

১৩. হযরত ইয়াকূব (আঃ)

ইসহাক্ব (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছূ ও ইয়াকূব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকূব নবী হন। ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’। যার অর্থ আল্লাহ্র দাস। নবীগণের মধ্যে কেবল ইয়াকূব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দু’টি করে নাম ছিল। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অপর নাম ছিল ‘আহমাদ’ *(ছফ ৬১/৬)*। ইয়াকূব তার মামুর বাড়ী ইরাকের হারান (حران) যাবার পথে রাত হয়ে গেলে কেন‘আনের অদূরে একস্থানে একটি পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায়

---

১০৭ . *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।*

স্বপ্ন দেখেন যে, একদল ফেরেশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে। এরি মধ্যে আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

إنى سأبارك عليك واكثر ذريتك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك–

'অতিসত্বর আমি তোমার উপরে বরকত নাযিল করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেব, তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এই মাটির মালিক করে দেব'। তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশী মনে মানত করলেন, যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন, তাহ'লে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদতখানা স্থাপন করবেন এবং আল্লাহ তাকে যা রূযী দেবেন তার এক দশমাংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবেন'। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন। তিনি স্থানটির নাম রাখলেন, بيت إيل অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঘর।[১০৮] এই স্থানেই বর্তমানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' অবস্থিত, যা পরবর্তীতে প্রায় ১০০০ বছর পরে হযরত সুলায়মান (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন। মূলতঃ এটিই ছিল 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের' মূল ভিত্তি ভূমি, যা কা'বা গৃহের চল্লিশ বছর পরে ফেরেশতাদের দ্বারা কিংবা আদম পুত্রদের হাতে কিংবা ইসহাক্ব (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ইয়াকূব (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখান এবং তাঁর হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদতখানা তৈরী হয়।

ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াকূব হারানে মামুর বাড়ীতে গিয়ে সেখানে তিনি তার মামাতো বোন 'লাইয়া' (ليّا) ও পরে 'রাহীল' (راحيل)-কে বিবাহ করেন এবং দু'জনের মোহরানা অনুযায়ী ৭+৭=১৪ বছর মামুর বাড়ীতে দুম্বা চরান। ইবরাহীমী শরী'আতে দু'বোন একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। পরে মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ 'ইউসুফ'। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামীনের জন্মের পরেই তিনি মারা যান। তাঁর কবর বেথেলহামে (بيت لحم) অবস্থিত এবং 'ক্বরে রাহীল' নামে পরিচিত। পরে তিনি আরেক শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। ইয়াকূবের ১২ পুত্রের মধ্যে ইউসুফ নবী হন। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র লাভী (لاوى)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূণ নবী হন। এভাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশেই নবীদের সিলসিলা জারি হয়ে যায়। ইয়াকূব-এর অপর নাম 'ইসরাঈল' অনুযায়ী তাঁর বংশধরগণ 'বনু ইস্রাঈল' নামে পরিচিত হয়। হঠকারী ইহুদী-নাছারাগণ যাতে তারা 'আল্লাহ্‌র দাস' একথা বারবার স্মরণ করে, সেকারণ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে 'বনু ইস্রাঈল' বলেই স্মরণ করেছেন।

হারান থেকে ২০ বছর পর ইয়াকূব তাঁর স্ত্রী-পরিজন সহ জন্মস্থান 'হেবরনে' ফিরে আসেন। যেখানে তাঁর দাদা ইবরাহীম ও পিতা ইসহাক্ব বসবাস করতেন। যা বর্তমানে 'আল-খলীল' নামে পরিচিত। পূর্বের মানত অনুসারে তিনি যথাস্থানে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন *(ঐ)*।

কেন'আন-ফিলিস্তীন তথা শাম এলাকাতেই তাঁর নবুঅতের মিশন সীমায়িত থাকে। ইউসুফ কেন্দ্রিক তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনীতে আলোচিত হবে। তিনি ১৪৭ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতার কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।

ইয়াকূবের অছিয়ত

কেন'আন থেকে মিসরে আসার ১৭ বছর পর মতান্তরে ২৩ বছরের অধিক কাল পরে ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে নিয়ে অছিয়ত করেন। সে অছিয়তটির মর্ম আল্লাহ নিজ যবানীতে বলেন,

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ- أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِن بَعْدِي قَالُوْا نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَّاحِداً وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ–

'এরই অছিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' *(বাক্বারাহ ১৩২)*। 'তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের উপাস্যের ইবাদত করব- যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতি সমর্পিত' *(বাক্বারাহ ২/১৩৩)*।

শুরুতে বলা হয়েছে 'এরই অছিয়ত করেছিলেন ইবরাহীম। কিন্তু সেটা কি ছিল? আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

১০৮. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮২।*

‘স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, আত্মসমর্পণ কর। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম’ *(বাক্বারাহ ২/১৩১)*। অর্থাৎ ইবরাহীমের অছিয়ত ছিল তাঁর সন্তানদের প্রতি ইসলামের। তাঁর পৌত্র ইয়াকূবেরও অছিয়ত ছিল স্বীয় সন্তানদের প্রতি ইসলামের। এজন্য ইবরাহীম তার অনুসারীদের নাম রেখেছিলেন- ‘মুসলিম’ বা আত্মসমর্পিত *(হজ্জ ২২/৭৮)*। ইবরাহীম তাঁর অপর প্রার্থনায় মুসলিম-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ‘যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, তার বিষয়ে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*।

বুঝা গেল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব প্রমুখ নবীগণের ধর্ম ছিল ‘ইসলাম’। তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র ইবাদতে একত্ব। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র স্বীকৃতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনুসারী হবার দাবীদার ইহুদী-নাছারাগণ তাদের নবীগণের সেই অছিয়ত ভুলে যায় এবং অবাধ্যতা, যিদ ও হঠকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়।

ইবরাহীম ও ইয়াকূবের অছিয়তে এটা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জন্য দুনিয়াবী ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ঈমানী সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার অছিয়ত করে যাওয়াই হ’ল দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ১৩২-১৩৩; ১৩৬, ১৪০; আলে ইমরান ৮৪; নিসা ১৬৩; মায়েদাহ ৮৪-৮৫; হূদ ৭১; ইউসুফ ৪-৯=৬; ১১-১৪=৪; ১৫-১৮=৪; ৩৮; ৬৩-৬৮=৬; ৭৮-৮৭=১০; ৯৩-১০০=৮ মোট ৩৯; মারিয়াম ৬, ৪৯-৫০; আম্বিয়া ৭২-৭৩; আনকাবূত ২৭; ছোয়াদ ৪৫-৪৭=৩।

২৪. হযরত ইউসুফ (আঃ)

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন, الكريمُ بنُ الكريمِ بنِ الكريمِ بنِ الكريمِ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ اسحاقَ بنِ ابراهيمَ عليهمُ السلامُ، ‘নিশ্চয়ই মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক্ব, তাঁর পুত্র ইয়াকূব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ ‘আলাইহিমুস সালাম’।[১০৯]

নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) হ’লেন একমাত্র নবী, যাঁর পুরা কাহিনী একটি মাত্র সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এর ১১১টি আয়াতের মধ্যে ৩ থেকে ১০১ আয়াত পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

নাযিলের কারণঃ সত্যনবী এবং শেষনবী জেনেও কপট ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতি পদে পদে কষ্ট দিত এবং পরীক্ষা করার চেষ্টা করত। তাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের কাজই ছিল সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। এমনই কার্যধারায় (মদীনা থেকে মক্কায় প্রেরিত) তাদেরই একটি দল একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করে বসল যে, আপনি যদি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী হন, তাহ’লে বলুন দেখি, ইয়াকূব-পরিবার শাম (সিরিয়া) থেকে মিসরে কেন হিজরত করেছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রকৃত ঘটনা কি ছিল? তাদের পণ্ডিতেরা তওরাত-ইঞ্জীলে বর্ণিত উক্ত ঘটনা আগে থেকেই জানতো। তাওরাত-যবূর-ইনজীল সবই ছিল হিব্রু ভাষায় রচিত। আমাদের রাসূল নিজের ভাষাতেই লেখাপড়া জানতেন না, অন্যের ভাষা জানা তো দূরের কথা। ইহুদী নেতাদের সূক্ষ্ম পলিসি ছিল এই যে, উক্ত বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষে জবাব দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে লোকদের মধ্যে তার নবুঅতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা যোরদার করা সম্ভব হবে।

বস্তুতঃ তাদের প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ (আঃ) ও ইয়াকূব পরিবারের প্রকৃত ঘটনা ‘অহি’ মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে দেন। যা ছিল রাসূলের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মু‘জেযা।[১১০] শুধু ইউসুফের ঘটনাই নয়, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত বাকী ২৪ জন নবী ও তাঁদের কওমের ঘটনাবলী বর্ণনা ছিল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য মু‘জেযা। কেননা তাঁদের কারু সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের সম্পর্কে লিখিত কোন বই-পত্র সে যুগে ছিল না। আর তিনি নিজে কারু কাছে কখনো লেখাপড়া শিখেননি। অথচ বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া বিগত শিক্ষণীয় ঘটনাবলী তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন কুরআনের

---

১০৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৪ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩।*

১১০. *উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্র বাইবেলে বিকৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে (দ্রঃ সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন ২/২৪৪-২৪৬।*

মাধ্যমে। এগুলিই তাঁর নবুঅতের অন্যতম প্রধান দলীল ছিল। এরপরেও খাছ করে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর পরিবারের ঘটনাবলী ছিল বিগত ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। যার প্রয়োজনীয় অংশগুলি গুছিয়ে একত্রিতভাবে উপস্থাপন করাই হ'ল সূরা ইউসুফের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

সুন্দরতম কাহিনীঃ

অন্যান্য নবীদের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ নবীর ঘটনা একত্রে সাজিয়ে একটি সূরাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেকারণে এটিকে أَحْسَنُ الْقَصَصِ 'সুন্দরতম কাহিনী' বলা হয়েছে *(ইউসুফ ১২/৩)*। **দ্বিতীয়তঃ** এর মধ্যে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। **তৃতীয়তঃ** অন্যান্য নবীদের কাহিনীতে প্রধানতঃ উম্মতের অবাধ্যতা ও পরিণামে তাদের উপরে আপতিত গযবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে এসবের কিছু নেই। বরং সেখানে রয়েছে দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা এবং আল্লাহ্র উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় জীবন নাট্য। যা পাঠ করলে যেকোন বোদ্ধা পাঠকের জীবনে সৃষ্টি হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদ্দীপনা।

আরবী ভাষায় কেন?

আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে আরবী কুরআন হিসাবে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী যারা জানতে চেয়েছিল, তারা ছিল আরবীয় ইহুদী এবং মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। তাই তাদের বোধগম্য হিসাবে আরবী ভাষায় উক্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরবীতেই সমগ্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ভাষাগর্বী আরবরা কুরআনের অপূর্ব ভাষাশৈলীর কাছে মার খেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কিতাবধারী ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতেরা কুরআনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সমূহের সত্যতা ও সারবত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

কাহিনীর সার-সংক্ষেপ

কাহিনীটি শৈশবে দেখা ইউসুফের একটি স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তার সমাপ্তি ঘটেছে উক্ত স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে। মাঝখানের ২২/২৩ বছর মতান্তরে চল্লিশ বছর অনেকগুলি চমকপ্রদ ঘটনায় পূর্ণ। কাহিনী অনুযায়ী ইউসুফ শৈশবকালে স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। তিনি এই স্বপ্ন পিতা হযরত ইয়াকূবকে বললে তিনি তাকে সেটা গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তা ফাঁস হয়ে যায় এবং সৎভাইয়েরা হিংসা বশতঃ ষড়যন্ত্র করে তাকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। তিনদিন পরে পথহারা ব্যবসায়ী কাফেলার লোকদের নিক্ষিপ্ত বালতিতে করে তিনি উপরে উঠে আসেন। পরে ঐ ব্যবসায়ীরা তাকে মিসরের রাজধানীতে বিক্রি করে দেয়। ভাগ্যক্রমে মিসরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী ক্বিৎফীর (قطفير) তাকে খরিদ করে বাড়ীতে নিয়ে যান ক্রীতদাস হিসাবে। কয়েক বছরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণকারী ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীর নিঃসন্তান স্ত্রী যুলায়খার আসক্তি জন্মে। ফলে শুরু হয় ইউসুফের জীবনে আরেক পরীক্ষা। একদিন যুলায়খা ইউসুফকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। তাতে ইউসুফ সম্মত না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে পিছন থেকে যুলায়খা তার জামা টেনে ধরলে তা ছিঁড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই দু'জনে ধরা পড়ে যায় বাড়ীর মালিক ক্বিৎফীরের কাছে। পরে যুলায়খার কথামতে নির্দোষ ইউসুফের জেল হয়। যুলায়খা ছিলেন মিসররাজ রাইয়ান ইবনু অলীদের ভাগিনেয়ী।[১১১]

অন্যূন সাত বছর জেল খাটার পর বাদশাহ্র এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর মুক্তি হয়। পরে তিনি বাদশাহ্র অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বাদশাহর আনুকূল্যে তিনিই হন সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র শাসক। ইতিমধ্যে ক্বিৎফীরের মৃত্যু হ'লে বাদশাহ্র উদ্যোগে বিধবা যুলায়খার সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[১১২] বাদশাহ্র দেখা স্বপ্ন মোতাবেক মিসরে প্রথম সাত বছর ভাল ফসল হয় এবং পরের সাত বছর ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় সুদূর কেন'আন থেকে তাঁর বিমাতা দশ ভাই তাঁর নিকটে খাদ্য সাহায্য নিতে এলে তিনি তাদের চিনতে পারেন। কিন্তু নিজ পরিচয় গোপন রাখেন। পরে তাঁর সহোদর একমাত্র ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে আনা হ'লে তিনি তাদের সামনে নিজের পরিচয় দেন এবং নিজের ব্যবহৃত জামাটা ভাইদের মাধ্যমে পিতার নিকটে পাঠিয়ে দেন। পুত্র শোকে অন্ধ পিতা ইয়াকূবের মুখের উপরে উক্ত জামা রেখে দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর দু'চোখ খুলে যায়। অতঃপর ইউসুফের আবেদন ক্রমে তিনি সপরিবারে মিসর চলে আসেন। ইউসুফ তার ভাইদের ক্ষমা করে দেন।

---

১১১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ১/১৯০।*

১১২. *আল-বিদায়াহ ১/১৯৬-১৯৭। তবে মানছূরপুরী বলেন, তাঁর বিবাহ 'আসনাথ' নাম্নী এক মহিলার সাথে হয়েছিল। -রাহমাতুললিল আলামীন ৩/১০৭। হ'তে পারে দু'জনেই তার স্ত্রী ছিলেন।*

অতঃপর ১১ ভাই ও বাপ-মা তাঁর প্রতি সম্মানের সিজদা করেন। এভাবেই শৈশবে দেখা ইউসুফের স্বপ্ন সার্থক রূপ পায় (অবশ্য ইসলামী শরী'আতে কারু প্রতি সম্মানের সিজদা নিষিদ্ধ)। সংক্ষেপে এটাই হ'ল ইউসুফ (আঃ) ও ইয়াকূব পরিবারের ফিলিস্তীন হ'তে মিসরে হিজরতের কারণ ও প্রেক্ষাপট, যে বিষয়ে ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল মূলতঃ তাঁকে ঠকাবার জন্য।

সূরাটি মক্কায় নাযিল হওয়ার কারণ

মক্কায় কোন ইহুদী-নাছারা বাস করত না। ইউসুফ ও ইয়াকূব পরিবারের ঘটনা মক্কায় প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ বিষয়ে অবগতও ছিল না। তাহ'লে সূরা ইউসুফ কেন মক্কায় নাযিল হ'ল?

এর জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গেলে সেখানকার ইহুদী-নাছারা নেতৃবর্গ তাওরাত-ইনজীলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁকে ঠিকই চিনে ফেলে *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০)*। কিন্তু অহংকার বশে মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক শেষনবী (ছাঃ) যাতে মদীনায় হিজরত করতে না পারেন এবং মক্কাতেই তাঁকে শেষ করে ফেলা যায়, সেই কপট উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের একদল ধুরন্ধর লোক মক্কায় প্রেরিত হয়। তারা এসে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে লাগল যে, বলুন কোন্ নবীর এক পুত্রকে শাম হ'তে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয়। কোন্ নবী সন্তানের বিরহ-বেদনায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যান ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি বাছাই করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনাটি মক্কায় সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া মক্কায় কিতাবধারী ইহুদী-নাছারা কেউ বসবাস করত না যে, লোকেরা তাদের কাছ থেকে এ ঘটনার কিছু শুনবে। ফলকথা, মক্কায় এটি ছিল অপরিচিত এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। অতএব মক্কার লোকেরাই যে বিষয়ে জানে না, সে বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর জানার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে নিশ্চয়ই তিনি বলতে পারবেন না এবং অবশ্যই তিনি অপদস্থ হবেন। তখন মক্কার কাফেরদের কাছে একথা রটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যে, মুহাম্মাদ কোন নবী নন, তিনি একজন ভণ্ড ও মতলববাজ লোক। বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করার কারণে তখন লোকেরা তাকে হয়ত পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

যাইহোক ইহুদীদের এ কুটচাল ও কপট উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ইউসুফ নাযিল হয় এবং তাতে ইউসুফ ও ইয়াকূব-পরিবারের ঘটনাবলী এমন নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয়, যা তওরাত ও ইনজীলেও ছিল না। বস্তুতঃ এটি ছিল শেষনবী (ছাঃ)-এর একটি প্রকাশ্য মু'জেযা।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী

ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আঃ)। তাঁরা সবাই কেন'আন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইউসুফ (আঃ) ও বেনিয়ামীন। শেষোক্ত সন্তান জন্মের পরপরই তার মা মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর অপর এক বোন লায়লা-কে বিবাহ করেন। ইউসুফ-এর সাথে মিসরে পুনর্মিলনের সময় ইনিই মা হিসাবে সেখানে পিতার সাথে উপস্থিত ছিলেন।[১১৩]

হযরত ইয়াকূব (আঃ) মিসরে পুত্র ইউসুফের সাথে ১৭ বছর মতান্তরে ২০ বছরের অধিককাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে অছিয়ত করে যান যেন তাঁকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী হেবরন মহল্লায় পিতা ইসহাক্ব ও দাদা ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশে সমাহিত করা হয় এবং তিনি সেখানেই সমাধিস্থ হন। যা এখন 'খলীল' মহল্লা বলে খ্যাত। হযরত ইউসুফ (আঃ) ১১০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিও হেবরনের একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সন্তানদের নিকটে অছিয়ত করে যান। এর দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চলের বরকত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। হযরত ইয়াকূব-এর বংশধরগণ সকলে 'বনু ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়। তাঁর বারো পুত্রের মধ্যে মাত্র ইউসুফ নবী হয়েছিলেন। তাঁর রূপ-লাবণ্য ছিল অতুলনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি মি'রাজ রজনীতে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে দেখলাম যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করেছেন'।[১১৪] উল্লেখ্য যে, ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারাকে 'পূর্ণ চন্দ্রের' সাথে তুলনা করেছেন'।[১১৫] যেদিকে ইঙ্গিত করেই কবি গেয়েছেন-

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری
آنچه خوبه همه دارند تو تنها داری

'ইউসুফের সৌন্দর্য, ঈসার ফুঁক ও মূসার দীপ্ত হস্ততালু- সবকিছুই যে হে নবী, তোমার মাঝেই একীভূত'।

১১৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৪*।
১১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ 'মি'রাজ' অধ্যায়*।
১১৫. *বুখারী হা/৩৩৮০ 'নবীর গুণাবলী' অনুচ্ছেদ*।

Contents

যুলায়খা-র গর্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর দু'টি পুত্র সন্তান হয়। তাদের নাম ছিল ইফরাঈম ও মানশা। ইফরাঈমের একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়। পুত্র ছিলেন 'নূন' যার পুত্র 'ইউশা' নবী হন এবং কন্যা ছিলেন 'রাহ্‌মাহ' (বা রহীমা), যিনি আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন'।[১১৬] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মিসরে ইউসুফের সময়কাল

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন, ঐ সময় মিসরের সম্রাট ছিলেন 'আমালেক্বা' জাতির জনৈক রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফের কাছে মুসলমান হন এবং ইউসুফকে মিসরের সর্বময় ক্ষমতায় বসিয়ে বলেন, لستُ أعظمَ منك إلا بالكرسى 'আমি আপনার চাইতে বড় নই, সিংহাসন ব্যতীত'। এ সময় ইউসুফের বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর।[১১৭] পক্ষান্তরে তারীখুল আম্বিয়ার লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে মিসরে যুগ যুগ ধরে রাজত্বকারী ফেরাঊন রাজাদের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে প্রমাণ করেন যে, ঐ সময় 'হাকসূস' রাজারা (ملوك الهكسوس) ফেরাঊনদের হটিয়ে মিসর দখল করেন এবং দু'শো বছর যাবত তারা সেখানে রাজত্ব করেন। যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় দু'হাযার বছর পূর্বের ঘটনা'।[১১৮]

উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কাল ছিল ঈসা (আঃ)-এর অন্যূন আঠারশ' বছর পূর্বেকার। তবে সুলায়মান মানছূরপুরী বলেন, আনুমানিক ১৬৮৬ বছর পূর্বের। হ'তে পারে কেউ ইউসুফের সময়কালের শুরু থেকে এবং কেউ তাঁর মৃত্যু থেকে হিসাব করেছেন। তবে তাঁর সময় থেকেই বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে বসবাস করতে শুরু করে। ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় চারশ' বছর পরে অত্যাচারী রাজা ফেরাঊনদের আমলে বনু ইস্রাঈলের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ত্রিশ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়।[১১৯] এই সময় আল্লাহ তাদেরকে ফেরাঊনের অত্যাচার হ'তে বাঁচানোর জন্য মূসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। এটা ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার ঘটনা।[১২০]

শৈশবে ইউসুফের লালন-পালন ও চুরির ঘটনা

হাফেয ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ-এর জন্মের কিছুকাল পরেই বেনিয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন। বেনিয়ামীন জন্মের পরপরই তাদের মায়ের অল্প বয়সে মৃত্যু ঘটে।[১২১] তখন মাতৃহীন দুই শিশুর লালন-পালনের ভার তাদের ফুফুর উপরে অর্পিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে এত বেশী রূপ-লাবণ্য এবং মায়াশীল ব্যবহার দান করেছিলেন যে, যেই-ই তাকে দেখত, সেই-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। ফুফু তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদণ্ড চোখের আড়াল হ'তে দিতেন না। এদিকে বিপত্নীক ইয়াকূব (আঃ) মাতৃহীনা দুই শিশু পুত্রের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর আকৃষ্ট এবং সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। ইতিমধ্যে ইউসুফ একটু বড় হ'লে এবং হাঁটাচলা করার মত বয়স হ'লে পিতা ইয়াকূব (আঃ) তাকে ফুফুর নিকট থেকে আনতে চাইছেন। কিন্তু ফুফু তাকে ছাড়তে নারায। ওদিকে পিতাও তাকে নিয়ে আসতে সংকল্পবদ্ধ। শুরু হ'ল পিতা ও ফুফুর মধ্যে মহব্বতের টানাপড়েন। ফলে ঘটে গেল এক অঘটন।

অধিক পীড়াপীড়ির কারণে ইউসুফকে যখন তার পিতার হাতে তুলে দিতেই হ'ল, তখন স্নেহান্ধ ফুফু গোপনে এক ফন্দি করলেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর নিকট থেকে একটা হাঁসুলি পেয়েছিলেন। যেটাকে অত্যন্ত মূল্যবান ও বরকতময় মনে করা হ'ত। ফুফু সেই হাঁসুলিটিকে ইউসুফ-এর কাপড়ের নীচে গোপনে বেঁধে দিলেন।

অতঃপর ইউসুফ তার পিতার সাথে চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার মূল্যবান হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। পরে তল্লাশী করে তা ইউসুফের কাছে পাওয়া গেল। ইয়াকূবী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে তার গোলাম হিসাবে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকূব (আঃ)ও দ্বিরুক্তি না করে সন্তানকে তার ফুফুর হাতে পুনরায় সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ততদিন ইউসুফ তার কাছেই রইলেন।[১২২]

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ নিজের অজান্তে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিষয়টি সবার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল যে, তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারেই নির্দোষ। ফুফুর অপত্য স্নেহই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য কথাটি তার সৎভাইদেরও জানা ছিল। কিন্তু এটাকেই তারা ইউসুফের মুখের উপরে বলে দেয় যখন আরেক বানোয়াট চুরির অভিযোগে বেনিয়ামীনকে মিসরে গ্রেফতার করা হয়। ইউসুফ তাতে দারুণ মনোকষ্ট পেলেও তা চেপে রাখেন।

বলা বাহুল্য, শৈশবে যেমন ইউসুফ স্বীয় ফুফুর স্নেহের চক্রান্তে পড়ে চোর (?) সাব্যস্ত হয়ে ফুফুর গোলামী করেন,

১১৬. *ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৬-৫৭।*
১১৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৯৬-১৯৭।*
১১৮. *তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ১/১২৪।*
১১৯. *তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ১৪০।*
১২০. *তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০।*

১২১. *আল-বিদায়াহ ১/১৮৪।*
১২২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ৭৭।*

Contents

যৌবনে তেমনি যুলায়খার চক্রান্তে পড়ে মিথ্যা অপবাদে সাত বছর জেল খাটেন- যে ঘটনা পরে বর্ণিত হবে।

ইউসুফ-এর স্বপ্ন

বালক ইউসুফ একদিন তার পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর কাছে এসে বলল,

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَا أَبتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ-

‘আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে’। একথা শুনে পিতা বললেন,

قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

‘বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ’লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(ইউসুফ ১২/৪-৫)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ বলেন, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগারো ভাই এবং সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা বা খালা’।[১২৩] বস্তুতঃ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় যখন মিসরে পিতা-পুত্রের মিলন হয়।

উল্লেখ্য যে, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব সকলে এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবতঃ একারণেই ইয়াকূব (আঃ) নিশ্চিত ধারণা করেছিলেন যে, বালক ইউসুফ একদিন নবী হবে। হযরত ইউসুফকেও আল্লাহ এ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

‘এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন (নবী হিসাবে) এবং তোমাকে শিক্ষা দিবেন বাণী সমূহের (অর্থাৎ স্বপ্নাদিষ্ট বাণী সমূহের) নিগূঢ় তত্ত্ব এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ সমূহ (যেমন মিসরের রাজত্ব, সর্বোচ্চ সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভ এবং পিতার সাথে মিলন প্রভৃতি) তোমার প্রতি ও ইয়াকূব-পরিবারের প্রতি, যেমন তিনি পূর্ণ করেছিলেন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক্বের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ *(ইউসুফ ১২/৬)*।

উপরোক্ত ৫ ও ৬ আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমন, (১) ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের দেখা স্বপ্নকে একটি সত্য স্বপ্ন হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউসুফ-এর জীবনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেজন্য তার জীবনে আসতে পারে কঠিন পরীক্ষা সমূহ। (২) ভাল স্বপ্নের কথা এমন লোকের কাছে বলা উচিত নয়, যারা তার হিতাকাংখী নয়। সেজন্যেই ইয়াকূব (আঃ) বালক ইউসুফকে তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তার সৎ ভাইদের কাছে বলতে নিষেধ করেছিলেন। (৩) ইউসুফকে আল্লাহ তিনটি নে‘মত দানের সুসংবাদ দেন। (ক) আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন নবী হিসাবে (খ) তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন (গ) তার প্রতি স্বীয় নে‘মত সমূহ পূর্ণ করবেন। বলা বাহুল্য, এগুলির প্রতিটিই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যা আমরা পরবর্তী কাহিনীতে অবলোকন করব। এক্ষণে ইউসুফকে উপরোক্ত ৬ আয়াতে বর্ণিত অহী আল্লাহ কখন নাযিল করেছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে ১৫ আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার আগেই উপরোক্ত অহীর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এটি নবুঅতের ‘অহিয়ে কালাম’ ছিল না। বরং এটি ছিল মূসার মায়ের কাছে অহী করার ন্যায় ‘অহিয়ে ইলহাম’। কেননা নবুঅতের ‘অহি’ সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে।

ভাইদের হিংসার শিকার হলেন

এটা একটা স্বভাবগত রীতি যে, বিমাতা ভাইয়েরা সাধারণতঃ পরস্পরের বিদ্বেষী হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই বিদ্বেষ যাতে মাথাচাড়া না দেয়, সেকারণ ইয়াকূব (আঃ) একই শ্বশুরের পরপর তিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এরপরেও শ্বশুর ছিলেন আপন মামু। পরস্পরে রক্ত সম্পর্কীয় এবং ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নবী পরিবারের সার্বক্ষণিক দ্বীনী পরিবেশ ও নৈতিক প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বৈমাত্রেয় হিংসার কবল থেকে ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা রক্ষা পায়নি। তাই বলা চলে যে, ইউসুফের প্রতি তার সৎভাইদের হিংসার প্রথম কারণ ছিল বৈমাত্রেয় বিদ্বেষ। দ্বিতীয় কারণ ছিল- সদ্য মাতৃহীন শিশু হওয়ার কারণে তাদের দু’ভাইয়ের প্রতি পিতার স্বভাবগত স্নেহের আধিক্য। তৃতীয় কারণ ছিল, ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য, অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠব, আকর্ষণীয় ব্যবহার-মাধুর্য এবং অনন্য সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চতুর্থঃ ইউসুফের স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা যেকোন ভাবেই হৌক তাদের কানে পৌঁছে যাওয়া। বলা চলে যে,

১২৩. *কুরতুবী, ইউসুফ ৪, ১০০*।

শেষোক্ত কারণটিই তাদের হিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় এবং তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার শয়তানী চক্রান্তে তারা প্ররোচিত হয়। কিন্তু শয়তান যতই চক্রান্ত করুক, আল্লাহ বলেন, –إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ‘শয়তানের চক্রান্ত সর্বদা দুর্বল হয়ে থাকে’ *(নিসা ৪/৭৬)*। ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যৎ নবুঅত লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই ইয়াকূব (আঃ) তার প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন। আর সেকারণে সৎ ভাইয়েরাও ছিল অধিক হিংসাপরায়ণ। বস্তুতঃ এই হিংসাত্মক আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ইউসুফের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান।

ইউসুফ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হ'লেন

দশ জন বিমাতা ভাই মিলে ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিল। তারা একদিন পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর কাছে এসে ইউসুফকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আনন্দ ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করল। তারা পিতাকে বলল যে, ‘আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব’। জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে’। ‘তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তাহ'লে তো আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে’ *(ইউসুফ ১২/১২-১৪)*। উল্লেখ্য যে, কেন'আন অঞ্চলে সে সময়ে বাঘের প্রাদুর্ভাব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপরে আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ খেলা করছে। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যকার একটি বাঘ এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ মাটির ভিতরে লুকিয়ে যায়’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াকূব (আঃ) তার দশ পুত্রকেই ব্যাঘ্র গণ্য করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে রূপকভাবে সেটা পেশ করেন। যাতে তারা বুঝতে না পারে *(কুরতুবী)*।

যাইহোক ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাযী হলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যাতে তারা ইউসুফকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় এবং তার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখে। অতঃপর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াহুদা বা রুবীল-এর হাতে ইউসুফকে সোপর্দ করলেন এবং বললেন, তুমিই এর খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সকল ব্যাপারে দেখাশুনা করবে।

কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই শয়তানী চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠলো। তারা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তখন বড় ভাই ইয়াহুদা তাদের বাধা দিল এবং পিতার নিকটে তাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে আরও বেশী যেদী করে তুলল। অবশেষে বড় ভাই একা পেরে না উঠে প্রস্তাব করল, বেশ তবে ওকে হত্যা না করে বরং ঐ দূরের একটা পরিত্যক্ত কূয়ায় ফেলে দাও। যাতে কোন পথিক এসে ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাতে তোমাদের দু'টো লাভ হবে। এক- সে পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ও তোমরা তখন পিতার নিকটবর্তী হবে। দুই- নিরপরাধ বালককে হত্যা করার পাপ থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

ভাইদের এই চক্রান্তের কথা আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্তভাবে

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ- إِذْ قَالُواْ لَيُوْسُفُ وَأَخُوْهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوْهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُوْنُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِيْنَ- قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوْسُفَ وَأَلْقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِيْنَ-

‘নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী’। ‘যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন’। ‘তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে আস। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরাই (পিতার নিকটে) যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে’। ‘তখন তাদের মধ্যেকার একজন (বড় ভাই) বলে উঠল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে, যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি একান্তই তোমাদের কিছু করতে হয়’ *(ইউসুফ ১২/৭-১০)*।

বড় ভাইয়ের কথায় সবাই একমত হয়ে ইউসুফকে কুয়ার ধারে নিয়ে গেল। এ সময় তারা তার গায়ের জামা খুলে নিল। নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, এ সময় ৬/৭ বছরের কচি বালক ইউসুফ তার ভাইদের কাছে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে হিংসায় উন্মত্ত করে দিয়েছিল। এই কঠিন মুহূর্তে ইউসুফকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার নিকটে অহী

Contents

নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে এটি নবুঅতের অহী ছিল না। কেননা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে আল্লাহ কাউকে নবী করেন না। এ অহী ছিল সেইরূপ, যেরূপ অহী বা ইলহাম এসেছিল শিশু মূসার মায়ের কাছে মূসাকে বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবার জন্য *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)*।

এ সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ-

'যখন তারা তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ'ল, এমতাবস্থায় আমি তাকে (ইউসুফকে) অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না' *(ইউসুফ ১২/১৫)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই অথবা পরে ইউসুফকে সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দিয়ে এ অহী নাযিল হয়েছিল। ইউসুফকে তার ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করল। সেখানেও আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন। তিনি কূয়ার নীচে একখণ্ড পাথরের উপরে স্বচ্ছন্দে বসে পড়লেন। বড় ভাই ইয়াহুদা গোপনে তার জন্য দৈনিক একটা পাত্রের মাধ্যমে উপর থেকে খাদ্য ও পানীয় নামিয়ে দিত এবং দূর থেকে সর্বক্ষণ তদারকি করত।

পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত

ইউসুফকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে একটা ছাগলছানা যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফের পরিত্যক্ত জামায় মাখিয়ে তারা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়ে ইউসুফকে বাঘে নিয়ে গেছে বলে কৈফিয়ত পেশ করল। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইউসুফের রক্ত মাখা জামা পেশ করল। হতভাগারা এটা বুঝেনি যে, বাঘে নিয়ে গেলে জামাটা খুলে রেখে যায় না। আর খুললেও বাঘের নখের আঁচড়ে জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া যে পিতার কাছে তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করছে, তিনি একজন নবী। অহীর মাধ্যমে তিনি সবই জানতে পারবেন। কিন্তু হিংসায় অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।

ইউসুফের ভাইদের দেওয়া কৈফিয়ত ও পিতার প্রতিক্রিয়া আল্লাহ বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত রূপে,

وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ-

'তারা (ভাইয়েরা) রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল'। 'এবং বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে বসিয়ে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী'। 'এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্ত মাখানো জামা হাযির করল। (এটা দেখে অবিশ্বাস করে ইয়াকূব বললেন, কখনোই নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটা কথা তৈরী করে দিয়েছে। (এখন আর করার কিছুই নেই), অতএব 'ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১২/১৬-১৮)*।

কাফেলার হাতে ইউসুফ

সিরিয়া থেকে মিসরে যাওয়ার পথে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পথ ভুলে জঙ্গলের মধ্যে উক্ত পরিত্যক্ত কূয়ার নিকটে এসে তাঁবু ফেলে।[১২৪] তারা পানির সন্ধানে তাতে বালতি নিক্ষেপ করল। কিন্তু বালতিতে উঠে এল তরতাযা সুন্দর একটি বালক 'ইউসুফ'। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হ'লেও সবকিছুই ছিল আল্লাহ্‌র পূর্ব পরিকল্পিত এবং পরস্পর সংযুক্ত অটুট ব্যবস্থাপনারই অংশ। ইউসুফকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ উক্ত কাফেলাকে পথ ভুলিয়ে এখানে এনেছেন। তাঁর গোপন রহস্য বুঝবার সাধ্য বান্দার নেই। আবুবকর ইবনু আইয়াশ বলেন, ইউসুফ কূয়াতে তিনদিন ছিলেন।[১২৫] কিন্তু আহলে কিতাবগণ বলেন, সকালে নিক্ষেপের পর সন্ধ্যার আগেই ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে তুলে নেয়।[১২৬] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

কাফেলার মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত বালতিতে ইউসুফ উপরে উঠে আসেন। অনিন্দ্য সুন্দর বালক দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো 'কি আনন্দের কথা। এ যে একটি বালক!' এরপর তারা তাকে মালিকবিহীন পণ্যদ্রব্য মনে করে লুকিয়ে ফেলল। কেননা সেযুগে মানুষ কেনাবেচা হ'ত। কিন্তু তারা গোপন করতে পারল না। কেননা ইতিমধ্যে ইউসুফের বড় ভাই এসে কূয়ায় তাকে না পেয়ে অনতিদূরে কাফেলার খোঁজ পেয়ে গেল। তখন সে কাফেলার কাছে বলল, ছেলেটি আমাদের পলাতক গোলাম। তোমরা ওকে আমাদের কাছ থেকে খরিদ করে নিতে পার'। কাফেলা ভাবল খরিদ করে না

১২৪. *কুরতুবী, ইউসুফ ১৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৯*।
১২৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ১৯*।
১২৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৮*।

নিলে চোর সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারি। অতএব তারা দশ ভাইকে হাতেগণা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে নিতান্ত সস্তা মূল্যে ইউসুফকে খরিদ করে নিল। এর দ্বারা ইউসুফের ভাইদের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। এক- যাতে ইউসুফ তার বাপ-ভাইদের নাম করে পুনরায় বাড়ী ফিরে আসার সুযোগ না পায়। দুই- যাতে ইউসুফ দেশান্তরী হয়ে যায় ও অন্যের ক্রীতদাস হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং কখনোই দেশে ফিরতে না পারে। এই সময়কার দৃশ্য কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। নিজের ভাইয়েরা ইউসুফকে পরদেশী কাফেলার হাতে তাদের পলাতক গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে। নবীপুত্র ইউসুফের মনের অবস্থা ঐ সময় কেমন হচ্ছিল। কল্পনা করা যায় কি? বালক ইউসুফ ঐ সময় বাড়ী যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কোন কথা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তাতে মনে হয়, বিক্রয়ের ঘটনাটি তার অগোচরে ঘটেছিল। ভাইদের সাথে পুনরায় দেখা হয়নি (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)। ইউসুফকে কূয়া থেকে উদ্ধার ও পরে পলাতক গোলাম হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে দেবার ঘটনা আল্লাহ্‌র ভাষায় নিম্নরূপ-

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ- وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُواْ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ-

'অতঃপর একটা কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠালো। সে বালতি নিক্ষেপ করল। (বালতিতে ইউসুফের উঠে আসা দেখে সে খুশীতে বলে উঠল) কি আনন্দের কথা! এযে একটি বালক! অতঃপর তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ ভালই জানেন, যা কিছু তারা করেছিল'। 'অতঃপর ওরা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিল হাতেগণা কয়েকটি দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে এবং তারা তার (অর্থাৎ ইউসুফের) ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল' *(ইউসুফ ১২/১৯-২০)*। মূলতঃ ইউসুফকে সরিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইউসুফ মিসরের অর্থমন্ত্রীর গৃহে

অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে বিক্রির জন্য মিসরের বাজারে উপস্থিত করল। মানুষ কেনা-বেচার সেই হাটে এই অনিন্দ্য সুন্দর বালককে দেখে বড় বড় ধনশালী খরিদ্দাররা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদার স্থানে সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাই সব খরিদ্দারকে ডিঙিয়ে মিসরের তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী ক্বিৎফীর (قطفير) তাকে বহুমূল্য দিয়ে খরিদ করে নিলেন। ক্বিৎফীর ছিলেন নিঃসন্তান।

মিসরের অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'আযীয' বা 'আযীয মিছর'। ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তিনি তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন এবং বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন কর। এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে'। বস্তুতঃ ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। ক্বিৎফীর তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যতের অশেষ কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তাকে সর্বোত্তম যত্ন সহকারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মূলতঃ এসবই ছিল আল্লাহ্‌র পূর্ব-নির্ধারিত। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপঃ

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবতঃ সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্যে যে তাকে আমরা বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ স্বীয় কর্মে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/২১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন (أفرس الناس ثلاثة)। **একজন** হ'লেন 'আযীযে মিছর' (যিনি ইউসুফের চেহারা দেখেই তাঁকে চিনেছিলেন)। **দ্বিতীয়** শো'আয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি এঁকে আপনার কর্মসহযোগী হিসাবে রেখে দিন। কেননা উত্তম সহযোগী সেই-ই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়' *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। **তৃতীয়** হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, যিনি ওমর ফারূককে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন'।[১২৭]

---

১২৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮৯; হাকেম ২/৩৭৬ হা/৩৩২০, হাকেম একে 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।*

ইউসুফ যৌবনে পদার্পণ করলেন

আযীযে মিছরের গৃহে কয়েক বছর পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হয়ে ইউসুফ অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَّعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ-

'অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(ইউসুফ ১২/২২)*।

উক্ত আয়াতে দু'টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি এবং প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করা। সকলে এ বিষয়ে একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভের অর্থ হ'ল নবুঅত লাভ করা। আর সেটা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে। অন্যদিকে পূর্ণ যৌবন লাভ তার পূর্বেই হয়। যা বিশ বছর থেকে ত্রিশ বা তেত্রিশের মধ্যে হয়ে থাকে। হযরত ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বান তেত্রিশ বছর বলেছেন এবং যাহহাক বিশ বছর বলেছেন। যাহহাক সম্ভবতঃ প্রথম যৌবন এবং ইবনু আব্বাস পূর্ণ যৌবনের কথা বলেছেন।

এক্ষণে ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আসক্তির ঘটনা নবুঅত লাভের পূর্বের না পরের, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ একমত নন। আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, যদিও যৌবন ও নবুঅতের কথা একই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি ঘটনা একই সময়ের নয়। নবুঅত তিনি চল্লিশ বছর বয়সেই পেয়েছেন ধরে নিলে যুলায়খার ঘটনা অবশ্যই তার পূর্বে তার পূর্ণ যৌবনেই ঘটেছে। কারণ ঐ সময় ইউসুফের রূপ-লাবণ্য নিশ্চয়ই শৈশবের ও প্রৌঢ় বয়সের চাইতে বেশী ছিল, যা যুলায়খার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। অথচ ইউসুফের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা নবীগণ ছোটবেলা থেকেই পবিত্র থাকেন।

যৌবনের মহা পরীক্ষায় ইউসুফ

রূপ-লাবণ্যে ভরা ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীপত্নী যুলায়খার অন্যায় আকর্ষণ জেগে উঠলো। সে ইউসুফকে খারাব ইঙ্গিত দিতে থাকল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ- وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءاً إِلاَّ أَن يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِيْنَ- وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِيْنَ- فَلَمَّا رَأَى قَمِيْصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ- يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ-

'আর সে যে মহিলার বাড়ীতে থাকত, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং (একদিন) দরজা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাছে এসো! ইউসুফ বলল, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ আপনার স্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' *(২৩)*। 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং ইউসুফ তার প্রতি (অনিচ্ছাকৃত) কল্পনা করেছিল। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত' (অর্থাৎ আল্লাহ নির্ধারিত উপদেশদাতা 'নফসে লাউয়ামাহ' তথা শাণিত বিবেক যদি তাকে কঠোরভাবে বাধা না দিত)। এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের একজন' *(২৪)*। 'তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার মুখে পেল। তখন মহিলাটি তাকে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হ'তে পারে'? *(২৫)*। 'ইউসুফ বলল, সেই-ই আমাকে (তার কুমতলব সিদ্ধ করার জন্য) ফুসলিয়েছে। তখন মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ'লে মহিলা সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী' *(২৬)*। 'আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী' *(২৭)*। 'অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্বীয় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) বলল, এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক' *(২৮)*। (অতঃপর তিনি ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) 'ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী' *(ইউসুফ ১২/২৩-২৯)*।

মহিলাদের সমাবেশে ইউসুফ

গৃহস্বামী দু'জনকে নিরস্ত করে ঘটনা চেপে যেতে বললেও ঘটনা চেপে থাকেনি। বরং নানা ডাল-পালা গজিয়ে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় পুত্রসম গোলামের সাথে অন্যায় কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তখন বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য যুলায়খা শহরের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের নিজ বাড়ীতে ভোজসভায় দাওয়াত দেবার মনস্থ করল। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপঃ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـــذَا بَشَراً إِنْ هَـــذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ- قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِيْنَ-

'নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অন্যায় কাজে ফুসলিয়েছে। সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি' *(৩০)*। 'যখন সে (অর্থাৎ যুলায়খা) তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন তাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করল এবং (ফল কাটার জন্য) তাদের প্রত্যেককে একটা করে চাকু দিল। অতঃপর ইউসুফকে বলল, এদের সামনে চলে এস। (সেমতে ইউসুফ সেখানে এল) অতঃপর যখন তারা তাকে স্বচক্ষে দেখল, তখন সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং (ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে) স্ব স্ব হাত কেটে ফেলল। (ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তারা) বলে উঠল, হায় আল্লাহ! এ তো মানুষ নয়। এ যে মর্যাদাবান ফেরেশতা!' *(৩১)*। '(মহিলাদের এই অবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়ে) যুলায়খা বলে উঠল, এই হ'ল সেই যুবক, যার জন্য তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এক্ষণে আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা যদি সে পালন না করে, তাহ'লে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে' *(ইউসুফ ১২/৩০-৩২)*।

উপরোক্ত আয়াতে যুলায়খার প্রকাশ্য দম্ভোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, উপস্থিত মহিলারাও ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং যুলায়খার কুপ্রস্তাবের সাথে তারাও ঐক্যমত পোষণ করে। যা ইউসুফের প্রার্থনায় বহুবচন ব্যবহার করায় বুঝা যায়। যেমন এই কঠিন পরীক্ষার সময়ে ইউসুফ আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

'হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি এদের চক্রান্ত কে আমার থেকে ফিরিয়ে না নাও, তবে আমি (হয়ত) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। 'অতঃপর তার পালনকর্তা তার প্রার্থনা কবুল করলেন ও তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(ইউসুফ ১২/৩৩-৩৪)*। শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিজ বাড়ীতে জমা করে তাদের সামনে যুলায়খার নিজের লাম্পট্যকে প্রকাশ্যে বর্ণনার মাধ্যমে একথাও অনুমিত হয় যে, সে সময়কার মিসরীয় সমাজে বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ব্যাপকতর ছিল।

নবীগণ নিষ্পাপ মানুষ ছিলেন

ইউসুফের প্রার্থনায় 'আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব' কথার মধ্যে এ সত্য ফুটে উঠেছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন এবং মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের মধ্যেও ছিল। তবে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাধীনে তাঁরা যাবতীয় কবীরা গোনাহ হ'তে মুক্ত থাকেন এবং নিষ্পাপ থাকেন। বেগানা নারী ও পুরুষের মাঝে চৌম্বিক আকর্ষণ এটা আল্লাহ সৃষ্ট প্রবণতা, যা অপরিহার্য। ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ এই প্রবণতা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করেননি। তাই তারা এসব থেকে মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেন, আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের আকাংখা করে, তখন তার ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটা নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। আর যদি পাপকাজটি সে করেই ফেলে, তবে একটির বদলে একটি গোনাহ লিপিবদ্ধ কর'।[১২৮]

---

১২৮. *বুখারী হা/৬১২৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ৩১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৩১ 'ঈমান' অধ্যায় ৬১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।*

অতএব ইউসুফ-এর অন্তরে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির আশংকাটি কেবল ধারণার পর্যায়ে ছিল। অতএব সেটা ছগীরা বা কবীরা কোনরূপ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিঃসন্দেহে ইউসুফ ছিলেন নির্দোষ ও নিষ্পাপ এবং পূত চরিত্রের যুবক।

ইউসুফের সাক্ষী কে ছিলেন?

উপরের আলোচনায় ২৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا 'ঐ মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল'- কিন্তু কে সেই ব্যক্তি, সে বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তবে ইবনু জারীর, আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, চারটি শিশু দোলনায় থাকতে কথা বলেছিল। তন্মধ্যে 'ইউসুফের সাক্ষী' (شاهد يوسف) হিসাবে একটি শিশুর কথা এসেছে। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ।[১২৯] কুরতুবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন, গৃহস্বামী 'আযীযে মিছরের' সাথী তাঁর একান্ত পরামর্শদাতা দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি। যিনি যুলায়খার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি ইউসুফের জামা সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে ছেঁড়া কি-না প্রমাণ হিসাবে পেশ করার কথা বলেন *(ইউসুফ ১২/২৬-২৮)*। যদি দোলনার শিশু সাক্ষ্য দিত, তাহ'লে সেটা অলৌকিক ঘটনা হ'ত এবং সেটাই যথেষ্ট হ'ত। অন্য কোন প্রমাণের দরকার হতো না'।[১৩০]

ইউসুফ জেলে গেলেন

শহরের বিশিষ্ট মহিলাদের সমাবেশে যুলায়খা নির্লজ্জভাবে বলেছিল, ইউসুফ হয় আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, নয় জেলে যাবে'। অন্য মহিলারাও যুলায়খাকে সমর্থন দিয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, সে যুগে নারী স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠেছিল। তাদের চক্রান্তের কাছে পুরুষেরা অসহায় ছিল। নইলে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেও মন্ত্রী তার স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার সাহস না করে নির্দোষ ইউসুফকে জেলে পাঠালেন কেন? অবশ্য লোকজনের মুখ বন্ধ করার জন্য ও নিজের ঘর রক্ষার জন্যও এটা হ'তে পারে।

ইউসুফ যখন বুঝলেন যে, এই মহিলাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নেই, তখন তিনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, আল্লাহ এরা আমাকে যে কাজে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্য শ্রেয়। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং তাদের চক্রান্তকে হটিয়ে দিলেন *(ইউসুফ ১২/২৩-২৪)*। এতে বুঝা যায় যে, চক্রান্তটা এক পক্ষীয় ছিল এবং তাতে ইউসুফের লেশমাত্র সম্পৃক্ততা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ইউসুফ যদি জেল খানাকে 'অধিকতর পসন্দনীয়' না বলতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তাহ'লে হয়তবা আল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার অন্য কোন ব্যবস্থা করতেন।

যাইহোক আযীযে মিছরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে ইউসুফ যুলায়খার হুমকি মতে জেল খানাকেই অধিকতর শ্রেয় বলেন। ফলে কারাগারই তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফকে বাঁচানোর জন্য কৌশল করলেন। 'আযীযে মিছর' ও তার সভাসদগণের মধ্যে ইউসুফের সততা ও সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল। তথাপি লোকজনের কানা-ঘুষা বন্ধ করার জন্য এবং সর্বোপরি নিজের ঘর রক্ষা করার জন্য ইউসুফকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ রাখাকেই তারা সমীচীন মনে করলেন এবং সেমতে ইউসুফ জেলে প্রেরিত হলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنٍ- 'অতঃপর এসব (সততার) নিদর্শন দেখার পর তারা (আযীয়ে মিছর ও তার সাথীরা) তাকে (ইউসুফকে) কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল' *(ইউসুফ ১২/৩৫)*।

[চলবে]

---

১২৯. *যঈফুল জামে' হা/৪৭৬২, ৪৭৭৫।*
১৩০. *তাফসীর কুরতুবী, ইউসুফ ২৬-২৮।*

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

*আব্দুল ওয়াদুদ**

ভূমিকা:

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দান একটি উত্তম কাজ। আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য কিতাব সহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং 'মু'জিযা' দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। রাসূলগণ নিজেদের উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীরাও হক্বের প্রতি মানুষদের ডেকেছেন যুগে যুগে। বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মাদী হিসাবে আমাদের উপর এ দায়িত্ব পালন অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে দাওয়াতের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

দাওয়াতের সংজ্ঞা:

আরবীতে 'দাওয়াত' (الدعوة) শব্দটি মাছদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থঃ ডাকা, আহ্বান করা। যেমন বলা হয়ে থাকে: আমি যায়েদকে ডেকেছি। দাওয়াত শব্দটি ডাকা ছাড়াও নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

* النداء বা আহ্বান করা। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه 'সেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে' *(বনী ইসরাঈল ৫২)*।

* الطلب من الأدني إلي الأعلي বা ছোটর পক্ষ হ'তে বড়র নিকটে চাওয়া। যেমন- আল্লাহ বলেন, أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'যখন আমার কাছে প্রার্থনা করা হয়, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও তার স্থান :

(১) আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের কাজ: আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট মানবতাকে হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে আল্লাহ বিরোধী সকল প্রকারের কর্ম পরিহার করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

'সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে' *(নিসা ১৬৫)*। জাহেলী সমাজের মানুষদেরকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنذِرْ- 'হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন' *(আল-মুদ্দাছছির ১-২)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

'হে রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যদি পৌঁছে না দেন তাহ'লে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَـــذِه سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

(২) নবীদের ও সৎ লোকদের অছিয়ত ছিল এই দাওয়াত: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলামের দাওয়াত দিয়ে জীবনের শেষলগ্নে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন:

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়, হ'তে পারে উপস্থিত ব্যক্তি থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞানী'।[১৩১] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ থেকে তোমরা পৌঁছে দাও'।[১৩২]

লোকমান হেকিম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ.

* *তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১৩১. *বুখারী ১/১১ পৃঃ, হা/৬৭।*
১৩২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৮৭, 'ইলম' অধ্যায়।*

‘হে বৎস! ছালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হ’তে নিষেধ করবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে’ *(লোকমান ১৭)*।

(৩) আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত হ’ল উত্তম কথা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

‘তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হ’তে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে, সৎ আমল করে এবং বলে যে, আমি একজন মুসলিম’ *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩)*।

(৪) দাওয়াতদাতা দাওয়াত অনুযায়ী আমলকারীর সমান নেকী পাবে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

‘যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াত বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের নেকীতে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদেরকে গোনাহ বা গুমরাহীর দিকে আহ্বান করবে সেই ব্যক্তিকেও গুমরাহীর অনুগামীদের সমান গুনাহ দেওয়া হবে। এতে এ লোকদের গোনাহে কোন প্রকার ঘাটতি হবে না’।[১৩৩] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَي خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه ‘কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে’।[১৩৪] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرُ النَّعَمِ.

‘আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হেদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম’।[১৩৫]

(৫) উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতীক হল দাওয়াত:

আল্লাহ্‌র বাণী:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ-

‘তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে’ *(আলে ইমরান ১১০)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

‘তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে কৃতকার্য’ *(আলে ইমরান ১০৪)*।

(৬) যারা দাওয়াত ছেড়ে দিবে তাদের উপর লা‘নত:

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُوْنَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوْنَ-

‘বণী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখত না। অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল’ *(মায়েদাহ ৭৮-৭৯)*।

(৭) দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেওয়া ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার অন্যতম কারণ:

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

‘যুগের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে তাকীদ দেয় সত্যের এবং তাকীদ দেয় ছবরের’ *(আছর ১-৩)*।

১৩৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮*।
১৩৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯*।
১৩৫. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫*।

Contents

(৮) আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করে দেন:

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

‘ঈমানদার পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে। এদের উপর আল্লাহ তা‘আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ’ *(তওবা ৭১)*।

অনুরূপভাবে মুনাফিকদের সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম। তারা অন্যায় কাজের আদেশ দেয়, ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। কাজেই তিনি তাদেরকে ভুলে গেছেন’ *(তওবা ৬৭)*।

(৯) একদল লোক দাওয়াতের কাজ না করলে আল্লাহ সবার উপর আযাব চাপিয়ে দিবেন:

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হল: একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্রযানে উঠল। তাদের কেউ নিচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হ’লে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নিচের তলার লোকেরা) পরস্পর বলল: আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ছিদ্র করে নেই তবে উপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদের এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তাদের বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং অপরকে বাঁচাতে পারবে।[১৩৬]

অন্য হাদীছে হুযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন। অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। অন্যথা অচিরেই আল্লাহ তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি প্রেরণ করবেন। তখন তোমরা তাকে আহ্বান করবে কিন্তু তোমাদের ডাকে কোন সাড়া দেওয়া হবে না’।[১৩৭]

দাওয়াতের হুকুম :

আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

‘আপনি মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করুন আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন’ *(নাহল ১২৫)*।

এটি ছালাত, ছিয়ামের ন্যায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয নয়। বরং সর্বাবস্থায় যরূরী নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِيْ إِلَّا فِرَاراً ، وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً-

‘তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রে আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও যিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে’ *(নূহ ৫-৯)*।

ইউসুফ (আঃ) জেলের মধ্যে গিয়েও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর জ্ঞানকে দাওয়াতের কাজে ব্যয় করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مَا تَعْبُدُوْنَ مِن دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

‘হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান

১৩৬. *বুখারী হা/২৪৯৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৭*।
১৩৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১*।

দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ৩৯-৪০)*।

দাওয়াতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফরয করার কৌশল:

(১) মানুষের নিকট আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় হক্ব হচ্ছে- তাঁর পরিচয়ের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া: দাওয়াত ব্যতীত মানুষকে আল্লাহ্র পরিচয় জানানো ও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

'এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে আনতে পার অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে, তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ' *(ইবরাহীম ১)*।

(২) মানুষের মনে ধ্বংস, ক্ষতি ও আযাবের ভয়ভীতি জাগ্রত করা: ভয়-ভীতিহীন অন্তর কখনো নেক আমল করতে আগ্রহী হয় না। ফলে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়। আর ইসলাম এসেছে মানুষকে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيبُوْا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيْكُمْ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম তামিল করো, যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন' *(আনফাল ২৪)*।

(৩) মানুষকে অন্ধকার ও গোমরাহী থেকে হেদায়াত ও আলোর দিকে ফিরিয়ে আনা: আল্লাহ বলেন, اللّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ 'আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বন্ধু তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান' *(বাক্বারাহ ২৫৭)*।

এখানে অন্ধকার বলতে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী, অন্যায়, পাপাচার, গোনাহ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর আলো বলতে হেদায়াত, সৎপথ, কল্যাণ, ভাল ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা এবং মানুষকে সে উদ্দেশ্যের দিকে ডাকা: আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল তার ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ- 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*।

(৫) মানুষের আক্বীদা ও আমল ছহীহ ও বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা: আক্বীদা বা অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও আমলের ঠিক না হ'লে তা কোনই কাজে আসবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সকল আমলই বিফলে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوْراً- 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি ক্বিয়ামত দিবসে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব' *(ফুরক্বান ২৩)*।

মানুষ দুনিয়াতে অনেক আমল করবে। কিন্তু তাদের আমলগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মত হবে না। তাই তাদের আমলগুলো ক্বিয়ামতের দিন গ্রহণ করা হবে না।

(৬) আল্লাহ বান্দার উপর যাতে দলীল উপস্থাপন করতে পারেন, যখন তাদের উপর সত্য পৌঁছানোর পর তা গ্রহণ না করার কারণে শাস্তি দিবেন। আর তাদের উপর শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্র উপর যুলুম হবে না। আল্লাহ বলেন, 'সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে' *(নিসা ১৬৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى-

'আমরা যদি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার পূর্বেই কোন আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতাম, তাহ'লে এই লোকেরাই বলতে পারত যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠালে না কেন? তাহ'লে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার পূর্বে আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলা শুরু করতাম' *(ত্ব-হা ১৩৪)*।

(৭) লোকদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা: কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬)*।

খারাপ ও বাতিলের দিকে দাওয়াত:

খারাপ ও বাতিলের দিকে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। কুরআন ও হাদীছে বাতিলের দিকে ডাকার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। শয়তান সব সময় মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয় ও খারাপ কাজের দিকে ডাকে। শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকের দিনে কিছু কিছু মানুষও অন্য

মানুষকে খারাপ কাজের দিকে ডাকছে। আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন শয়তান ও তার অনুসারীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তখন শয়তান জাহান্নামীদের উদ্দেশ্য করে বলবে-

إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই' *(ইবরাহীম ২২)*।

অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে যারা অন্যকে খারাপ পথের দিকে ডাকে এবং যারা ডাকে সাড়া দেয় উভয়ের মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন কথা কাটাকাটি হবে। অনুসারীরা নেতাদেরকে বলবে,

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً.

'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবা রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি' *(সাবা ৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً،

'যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে মানুষকে ডাকে, তার আমলনামায় উক্ত পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ লেখা হয়। এতে তাদের গুনাহ বিন্দু মাত্রও কম করা হবে না'।[১৩৮]

১৩৮. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৪*।

Contents

অর্থনীতির পাতা

পাশ্চাত্যের যুদ্ধ অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ভাঙ্গন

*ড. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী**

বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এখন মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে এই ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সামন্তবাদী ইউরোপের বুকে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটে। বিশ্বের নানা অঞ্চলের বিপুল সম্পদ সম্ভার লুণ্ঠন ও পুঞ্জীভূত করে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছে। খ্যাতিমান রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী পল ব্যারনের গবেষণায় দেখা যায় যে, কেবল ভারতবর্ষকে (বাংলা) লুণ্ঠন করেই পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়। ব্রিটিশ বণিক শাসকরা পলাশী বিপর্যয় (১৭৫৭) পরবর্তী তিন চার দশকে কোটি কোটি পাউন্ড অর্থ লুটপাট করে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের অন্যান্য জাতি/দেশগুলো একই কায়দায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যুগযুগ ধরে শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠে। নানা পর্ব-পর্যায় অতিক্রম করে একুশ শতকের প্রারম্ভে পুঁজিবাদী আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো আজ জরাগ্রস্ত, দর দালানের মতো মুখ থুবড়ে পড়ার দশায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দিকে দিকে পশ্চিমের প্রথাগত সাম্রাজ্যবাদী/উপনিবেশবাদী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এক নয়া বাণিজ্যিক/আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ অবিলম্বে চাঙ্গা হয়ে উঠে। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমের শক্তিশালী দেশসমূহ, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মানী, স্পেন, ইতালী নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়। তারা কার্যতঃ 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশসমূহের উপর যুগোপৎ রাজনৈতিক খবরদারী ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের নানা ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত হয়। যুদ্ধোত্তর কয়েক দশকের মধ্যে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে জ্বলে উঠে। প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি, বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব, সম্পদের দাপট ও নৃশংসতায় চরমে পৌছায় এরা।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে দ্বিমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসানের প্রেক্ষাপটে একচেটিয়া সামরিক অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগে পুঁজিবাদ এক চূড়ান্ত সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এই সময়কালে হাজির করা হয় বিভ্রান্তিকর বিশ্বায়নের তত্ত্ব, আর মুক্তবাজার অর্থনীতির চটকদার ফর্মুলা। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টোই অভিন্ন বিষয়, একই অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপস্থাপিত দু'টি আধিপত্যমূলক ধারণা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে এ নয়া বিশ্বব্যবস্থার পুরোধা-পুরোহিত। নয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবিলম্বে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিষদাঁত বসায়। কর্পোরেট পুঁজির বিস্তার বিনিয়োগ ও ব্যবসার আবরণে দেশে দেশে নির্লজ্জ লুণ্ঠন হয়ে ওঠে এদের মূল মোটিভ। সনাতনী পুঁজিবাদ মূলতঃ ব্যক্তি/গোষ্ঠীগত পর্যায়ে মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে। শোষিত-বঞ্চিত হয় সর্বহারা শ্রমিক মজদুর শ্রেণী, মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী প্রভৃতি। কিন্তু নয়া পুঁজিবাদ দুর্বল ও অনুন্নত জাতিসমূহকেই টার্গেট করে। ধনী দেশগুলো নিজের নানা পণ্যসামগ্রীর অবাধ বাজারে পরিণত করে এবং সেই সাথে কাঁচামাল ও এনার্জির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে। পাশ্চাত্য মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যে নয়া দর্শন উপস্থাপন করা হয় তার কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সীমান্তকে বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে মুছে ফেলা। পণ্যের বাড়তি উৎপাদন দিয়ে বাজার সয়লাব করে ভোক্তাদের নিরন্তর প্ররোচিত করা। আরও অর্থ ব্যয় করতে তাদের বাধ্য করা। আর ব্যক্তিগতভাবে যত খুশী সম্পদ জবাবদিহিতাহীনভাবে আহরণ করার, পুঁজির যথেচ্ছ পুঞ্জীভবন করার সুযোগ সৃষ্টি। অর্থাৎ লুণ্ঠন ও পুঞ্জীভবন (Plundering and Accumulation) হয়ে উঠেছে নয়া অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি।

অন্যকথায় 'লেইজেস ফেয়ার' এর নয়া মোড়কে 'পারি যে প্রকারে' নীতিতে বিশ্বের সমস্ত সম্পদকে হাতিয়ে নেয়া বা কুক্ষিগত করাই মুক্তবাজার অর্থনীতির সারকথা। দুর্বল অর্থনীতিকে হটিয়ে শক্তিমান অর্থনীতির স্থান করে দেয়া। নীতি-নৈতিকতাহীন এক যথেচ্ছ লুটেরা অর্থনীতি গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ পুঁজিবাদী মিত্রদের এই অনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ও দুর্বল/উন্নয়নশীল জাতিসমূহ হয়ে পড়ে অসহায়। বিশ্বের এক প্রান্তের মানুষ অলক্ষ্যে আরেক প্রান্তের লুটেরা অর্থনীতির ফাঁকে আটকা পড়ে। দরিদ্র দেশের গণমানুষকে পরিণত করা হয়েছে অসহায় ভোক্তায়। কখনো কখনো এর প্রকাশ্য অনুসঙ্গ হয়ে উঠেছে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ, সামরিক আগ্রাসনের হুমকি, দখলদারিত্ব, 'রেজিম চেঞ্জের' মত জঘন্য কার্যকলাপ। এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দুর্বল জাতি/সরকারকে একে একে বানানো হয়েছে আজ্ঞাবহ, পুতুল সরকার।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেকটা জোয়ার ভাটার মতো। একবার চাঙ্গা হয় আবার চুপসে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে 'চাঙ্গা হওয়া ও চুপষে যাওয়ার' খেলা (boom and bust cycle)। সমাজে যখন কোন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয় তখন পুঁজিপতিরা সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। উৎপাদন ও বিপণনের আকস্মিক বাজার গরম হয়ে উঠে। অর্থাৎ এ সময় পুঁজি বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিপণন, মুনাফা হয় রমরমা। এর

** প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

পরে যখন আস্তে আস্তে সমাজে চাহিদা হ্রাস পায়, তখন সবকিছু থেঁতিয়ে পড়তে থাকে। বাজারে ভাটার টান পরিলক্ষিত হয়, অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে। এরপর সূচিত হয় মন্দা। মন্দার প্রভাব পড়ে শ্রমিক, মালিক ও ভোক্তাদের উপর। থমকে যায় বিনিয়োগ ও উৎপাদন। পুঁজি ও উদ্বৃত্ত পণ্য এবার আটকা পড়ে যায় বাস্টের ফাঁদে। নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় মার্কেট ফোর্সেস সমূহ। দেখা দেয় মন্দা বা রিসেশন (recessyion)। মার্ক্সের ভাষায় এ পর্যায়ে উৎপাদন সম্পর্কের অবনতি ঘটে, পরস্পর বৈরীরূপ ধারণ করে। অর্থনীতিতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, সমাজে দেখা দেয় অস্থিরতা। এ সময় মার্কেট মেকানিজমে নতুন সমীকরণ ঘটে। কতক বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থা/কোম্পানী, ছোট-খাটো সংস্থার অ্যাসেট খরিদ করে নেয়। ফলে পুঁজি আরো কেন্দ্রীভূত হয়। আবার সৃষ্টি হয় নতুন বুম, সাময়িকভাবে উতরে যায় মন্দা। এ অবস্থা বেশিকাল চলে না। আবার বাস্ট গ্রাস করে পুঁজি ও পণ্যকে, ধস নামে বাজারে। শুরু হয় লক-আউট, অস্থিরতা, নৈরাজ্য। এ স্তরে এসে ঘটতে পারে শ্রমিক অসন্তোষ, গণঅভ্যুত্থান। সমাজ বিপ্লব যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। চিরতরে বদলে যেতে পারে উৎপাদন সম্পর্ক, বদলে যাবে উৎপাদনের মালিকানার ধরন। ঘটে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, লুটেরা অর্থনীতির উত্থান-পতনের ঘটে ইতি। এভাবেই বুম ও বাস্ট চক্রের চির অবসান ঘটে।

পাঁচ শতাব্দীর পর পুঁজিবাদ হয়ত সেখানেই এসে পৌঁছেছে। বিশ শতকের চিন্তা জগতে প্রভাব বিস্তারকারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একদল সমাজচিন্তাবিদের মতে পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি অমানবিক ও অনৈতিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। তাই পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। স্পেনে মুসলমানদের পতনের পর ইউরোপে যে নব উচ্ছ্বাস উন্মাদনা জাগে তার ফলে পশ্চিমের লোকেরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ে। দেশে দেশে বাণিজ্যিক অভিযাত্রা, সামরিক রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন ও মার্কেন্টাইল পুঁজির বিস্তারের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে পশ্চিমে। এই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের আরো কতিপয় অঞ্চলে উত্তরকালে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটে। জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা তার উদাহরণ। মূলতঃ পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থব্যবস্থা যার ভিত্তি হচ্ছে শোষণ, লুণ্ঠন ও প্রতারণা। তার অনুষঙ্গ হচ্ছে দালালী, ফটকাবাজী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি। এগুলো আবার পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাঙ্গা হবার আবার চুপসে পড়ারও একেকটা কারণ বটে। এহেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই পশ্চিমী দুনিয়া বিবেচনা করে থাকে মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম ও সর্বশেষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পর্ব হিসাবে। মানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরম আধার হিসাবে।

এই ব্যবস্থা সম্প্রতি আরো বেপরোয়া, নির্লজ্জ ও নির্মম হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে অবধারিত। উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদ এমন এক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার অভ্যন্তরেই এর ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত থাকে। সময় হ'লে পুঁজিবাদ আপনা থেকেই ধসে পড়বে অনিবার্যরূপে। পুঁজিবাদ যে উৎপাদন সম্পর্ক তৈরী করে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপর্যয় ও ধ্বংস বৈ আর কিছুই হ'তে পারে না। এক শতাব্দী পরে এসে মার্কসের পর্যবেক্ষণের সত্যতা আজ প্রতিপন্ন হচ্ছে। মার্কস যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন তখন পুঁজিবাদ দ্রুতবিস্তৃত ও সংহত হচ্ছিল চূড়ান্ত স্তর অভিমুখে। শতবর্ষ পরে এসে এখন পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছে নগ্ন নির্বিবেক ও সর্বগ্রাসী। তাই এর পতনও অনিরুদ্ধ।

॥ ২ ॥

এখন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে, দিকে দিকে পুঁজিবাদের সশব্দ পতন ধ্বনী বিশ্রুত হচ্ছে। আর এর সূচনা হয়েছে নয়া পুঁজিবাদের প্রধান প্রহরী, লুটেরা অর্থনীতির মূল স্ট্যাকহোল্ডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই। একে একে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি ধনী দেশ। প্রাচ্যের জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনেও এর ধাক্কা লেগেছে, কেঁপে উঠেছে তাদের অর্থনীতির ভিত। বসে পড়েছে এসব দেশে বড় বড় শিল্প কারখানা। কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে লাখ লাখ শ্রমজীবী মানুষ। বহু ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ছে দেউলিয়া। অতি দ্রুত অর্থনৈতিক মহামন্দার করাল ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। পুঁজিবাদের বিপর্যয় ও ভাঙ্গন হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। আর এই ভাঙ্গনের আওয়াজ প্রতিদিন প্রবলতর হয়ে উঠছে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন তার নিজ অর্থনীতির এই মহাবিপর্যয় ঠেকাতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন বেইল আউট প্লান, স্টিমুলস প্যাকেজ বা রেসকিউ প্রোগ্রাম এই ধসকে সামাল দিতে পারছে না। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢালা হচ্ছে দফায় দফায় কিন্তু এ বিপর্যয়ের দাবানলকে সামাল দেয়া যাচ্ছে না। পুঁজিবাদরে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যেন নিবৃত্ত হওয়ার নয়। ইতিমধ্যে এই মহামন্দার গডজিলার থাবায় দুমড়ে-মুচড়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সব থেকে বড় গাড়ী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল মটরস (জিএম)। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিখ্যাত ব্যাংক লীহম্যান ব্রাদার্স, ব্যাংক অব আমেরিকা, জিপি মর্গান, এআইজি প্রভৃতি নামকরা প্রতিষ্ঠান। এমনি আরো অনেক কোম্পানী, কর্পোরেট হাউস মুখ থুবড়ে পড়েছে। এআইজিকে বাঁচাতে দেয়া হয়েছে একটি বিশাল অংকের অর্থ। ইতিমধ্যে লাটে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেটের কারবার। বহু পরিবার বাসাবাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে, অনেকে হয়ে পড়েছে গৃহহীন, আশ্রয়হীন। চাকরি হারিয়েছে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। কেবল ফেব্রুয়ারীতেই যুক্তরাষ্ট্রে বেকার হয়েছে ৬ লাখ ৫০ হাযার মানুষ। এ বছর বেকারত্বের হার

Contents

কমবেশী ৮%, আগামী বছর তা বেড়ে দাঁড়াবে অন্ততঃ ১০% এ। বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেটে এবার ঘাটতি পড়েছে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। সবচেয়ে বড় অর্থনীতিই এখন সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আর এই মহামন্দার প্রভাব আজ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে।

এই মহামন্দার ঢেউ যুক্তরাজ্যেও আঘাত হেনেছে। প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ইতিমধ্যে পাঁচশত বিলিয়ন পাউন্ডের 'স্টিমুলাস প্যাকেজ' ঘোষণা করে গায়ের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তার আগেই ফিনল্যান্ডের ক্ষমতাসীন সরকার আর্থিক সঙ্কটে ভেঙ্গে পড়েছে। পশ্চিমের অন্যতম ধনী দেশ ফ্রান্সেও মন্দার প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ উত্তপ্ত। সম্প্রতি রাজধানী প্যারিসসহ দেশের দু'শটি বড় শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যায়। সরকারের ভাতা-ভর্তুকি ইত্যাদি প্রদানের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার লক্ষণ নেই। এছাড়াও জার্মানী, ইতালিসহ পশ্চিমের অনেক দেশে শুরু হয়েছে রাজপথে হাঙ্গামা, নৈরাজ্য। এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশ জাপান ছয় দশক পরে বিপর্যয়ের মুখোমুখি। বিখ্যাত অটোমোবাইল নির্মাতা টয়োটা এখন লোকসানের মুখে। শুধু টয়োটা নয়, পুরো জাপানী অর্থনীতি এখন সঙ্কটের মুখোমুখি।

'এক দেশ দুই অর্থনীতি'র দেশ মহাচীনও আজ মহামন্দার সম্মুখীন। ইতিমধ্যে ৮৫৬ বিলিয়ন ডলারের 'রেসকিউ প্যাকেজ' ঘোষণা করে আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে। তার লাখ লাখ বেকার শ্রমিক ফিরে গেছে গ্রামে। এহেন বেকারত্ব ও দেউলিয়াত্বের শোরগোলের মধ্যে চীন তার পাওনা সাড়ে ৭০০ বিলিয়ন ডলার পরিশোধের কথা জানিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। ১৮% রপ্তানী হ্রাসের মধ্যে বিলিয়ন ডলার প্যাকেজ ঘোষণা করে হতবিহ্বল দশায় চীন প্রোটেকশনিজমের আশ্রয় খুঁজছে। এর সাথে সুর মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত, রাশিয়া, ব্রাজিল। অর্থনীতির ধস ঠেকাতে এরাও খুঁজছে নানা কায়দা-কৌশল। অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

অন্যতম এশিয়ান টাইগার সিঙ্গাপুর সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করে পতনশীল অর্থনীতিকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিগত কয়েক সপ্তাহেই চাকরি হারিয়েছে ১৬ হাযার শ্রমিক-কর্মচারী। দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থাও ইতিমধ্যে করুণ। প্রায় ৪০% রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার ১২০ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ছেড়েছে। ইতিমধ্যেই ধস নেমেছে হুন্দাই, স্যামসাং প্রভৃতি বড় বড় কর্পোরেশনে। তথাকথিত 'বিগ ডেমোক্রাসি' ভারতের অবস্থাও দিনকে দিন সঙ্গিন হয়ে উঠছে। এ পর্যন্ত লাখ খানেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। রেসকিউ প্যাকেজ দেয়া হয়েছে ৬ বিলিয়ন ডলারের। একই অবস্থা ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনামের। তাদের অর্থনীতিও ধসে পড়ছে। শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছে। রপ্তানী হ্রাসের মধ্যে অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে সরকার। উদীয়মান মালয়েশিয়াও প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। নিরুপায় ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ মাত্র ৭০/৭৫ ডলারে তেল বিক্রি করার জন্য এক পায়ে খাড়া। তাদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন অগ্রগতির চাকা থেমে যাওয়ার উপক্রম। দরপতনের এ দুঃসময়ে তারা উৎপাদন হ্রাসও করতে পারছে না। তাতে তাদের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। এমনকি অতিশয় দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশগুলোও আর এই ধ্বংস প্রবাহের বাইরে থাকতে পারছে না। মহামারীর মতো মন্দা এসব দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। নেপাল, মালদ্বীপ, লাওস ও বাংলাদেশের মতো ছোট ছোট দেশগুলোর অর্থনীতি এখন ধুলিস্যাৎ হওয়ার অবস্থা। বাংলাদেশের বিপন্ন অর্থনীতিকে বাঁচাতে সাড়ে ছয় হাযার কোটি টাকার উদ্ধার প্লান হাতে নিতে হচ্ছে মহাজোট সরকারকে। এডিবি বলেছে, আগামী দুই বছরে জিডিপি হ্রাস পাবে শতকরা দুই ভাগের মতো। ইতিমধ্যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে ২৫%। কাজেই শ্রমিক ছাঁটাই হ'তে পারে। এতে বাড়বে বেকারত্ব, কমে আসবে রেমিটেন্স। প্রশ্ন হচ্ছে- এর শেষ কোথায়?

॥ ৩ ॥

বিশ্ব পুঁজিবাদের সর্বাধিনায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাগ্রে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে এই মহামন্দার প্রলক্ষণসমূহ। এর পিছনে রয়েছে তার দীর্ঘদিনের বিধ্বংসী যুদ্ধ-অর্থনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক ভয়ানক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এরা যুদ্ধকে একটি লাভজনক বাণিজ্যকৌশল হিসাবে আবিষ্কার করে। অর্থাৎ যুদ্ধ হচ্ছে এক ধরনের বিশাল লাভজনক ব্যবস্থা। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার একটি অভিনব কৌশল। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক F.G. Cook মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি-কৌশল বিশ্লেষণ করে দেশটিকে অভিহিত করেন 'যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র' (Warfare State) হিসাবে। গত সাত দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দেশে দেশে কখনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কখনো প্রক্সি (Proxy) যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই পঞ্চাশের দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র অবতীর্ণ হয় কোরিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধে। সেখানে আজও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। পাহারা দিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত। মার্কিনীরা সিকি শতাব্দী ধরে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে ভিয়েতনামে। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে এই নয়াকৌশল ক্রমশঃ নিবীড়তর হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ জড়িয়ে পড়েছিলেন উপসাগরীয় যুদ্ধে, কুয়েত-ইরাক সংঘর্ষের মধ্যে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সে দফায়

Contents

কয়েকশ’ বিলিয়ন ডলার ফায়দা লুটে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই ধারাবাহিকতায় যুদ্ধবাজ বুশ, ডিকচেনী, রামসফেল্ড, রাইসরা বিশ্ববিবেককে উপেক্ষা করে মানবতাকে পদদলিত করে আগ্রাসন চালায় আফগানিস্তানে ও ইরাকে। দৃশ্যতঃ এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস নির্মূলের শ্লোগানের আড়ালে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তেল-গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়া। মার্কিন অর্থনীতিকে রমরমা করা, বিশ্বে মোড়লিপনা যাহির করা। কিন্তু এর পরিণাম শুভ হয়নি। এসব বিধ্বংসী যুদ্ধ ও আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সংগোপনে সূচিত হয়েছে ভাঙ্গন, নেমে এসেছে প্রবল ধস। বিগত এক দশকে দেশটির জনসাধারণের আয় বেড়েছে মাত্র তিন শতাংশ। আর ব্যয় বেড়েছে বহুগুণ বেশী। জনগণ ক্রেডিট কার্ড, পেপার বন্ড, মর্টগেজ আর ফটকাবাজারীর ফাঁদে বাধা পড়েছে ক্রমশঃ। এক সময় তাও ফুরিয়ে এসেছে।

ইরাক আফগান রণাঙ্গনে যুদ্ধ যত ঘনীভূত হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি তার সাথে তাল মিলিয়ে চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। এই দুই রণাঙ্গনে রোজ খরচ হয় কয়েক মিলিয়ন ডলার করে। বিদায়ী বুশ প্রশাসন বার বার সিনেটে ও কংগ্রেসে ধর্ণা দিয়ে এই যুদ্ধের জন্য অর্থসংস্থান করেছে। অবশেষে গত বছরের শেষ দিকে আর্থিক দুর্যোগের প্রলক্ষণসমূহ পরিষ্কার হয়ে উঠে। মন্দাকবলিত হ’তে থাকে মার্কিন অর্থনীতি। প্রেসিডেন্ট বুশ ধস ঠেকাতে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বেইল আউট প্লান হাযির করে। বুশ তার মেয়াদের বাকি ক’টি দিন এভাবে কোন মতে পার করে সটকে পড়ে দৃশ্যপট থেকে। দেশকে ঠেলে দিয়ে যায় মহামন্দার ভাগাড়ের মধ্যে। বিগত ৩/৪ মাসে এই মহামন্দা কালো ছায়া বিস্তার করেছে সমগ্র বিশ্বে।

বস্তুতঃ আজকে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের এই যে ত্রাহি মধুসুদন দশা তার ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে ইরাক, আফগান যুদ্ধ। যুদ্ধবাজ মার্কিন নেতৃত্ব বিশ্বের দেশে দেশে আগ্রাসন চালিয়ে নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করতে চায়। ভয়-ভীতি দেখিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর মধ্য দিয়ে লুণ্ঠন করতে চায় দুর্বল রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ। দখলে রাখতে চায় তাদের জমিন, দমিয়ে রাখতে চায় সংস্কৃতিকে। কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে তারা অলক্ষ্যে নিজেদের পায়েই যেমন কুঠারাঘাত করেছে, তেমনি ভেঙ্গে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশে দেশে বেপরোয়া গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, বিশ্বজুড়ে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। দায়িত্বহীন ও উচ্চাভিলাসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্বে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির চলাচল হয়ে ওঠে দুর্দম। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়ায় বাজার ব্যবস্থা হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। যুদ্ধ-অর্থনীতি বিশ্ব সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। প্রকারান্তরে পুরো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিপর্যয়ের আবর্তে।

বিগত সাত দশক ধরেই বিশ্বের নানা প্রান্তে রয়েছে শত শত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। এসব ঘাঁটির ব্যবস্থাপনার জন্য ফিবছর ব্যয় হয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। দেশটির সবথেকে বড় সংস্থা হচ্ছে সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রের সমস্ত সেবা ও পণ্যের এক তৃতীয়াংশের ভোক্তা হচ্ছে সেনাবাহিনী। দেশের বার্ষিক বাজেটের অন্তত ৬০% ঘুরে ফিরে ব্যয়িত হয় এই প্রতিরক্ষা খাতে। এটি যে অনুৎপাদনশীল খাত তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন থেকে উনপঞ্চাশ বছর পূর্বে **১৯৬১** সালের **১৭** জানুয়ারী, প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার তার শেষ ভাষণে বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি দপ্তরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। গত পাঁচ দশকে ক্রমশঃ বেড়েছে সামরিক বাজেটের আয়তন। সেই ‘প্রভাব’ হয়ে উঠেছে আরও প্রবলতর, কর্তৃত্ব বিস্তার ও মারণাস্ত্রের খেলা চলছে নিরন্তর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্যনীতি, গ্লোবালাইজেশন ইত্যাদি। গ্লোবালাইজেশনের নামে বিশ্বের কোটি কোটি ভোক্তা, কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারী, ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের রক্ত ড্রাকুলার মতো চুষে নিংড়ে ছোবড়া করে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। দুর্বল অর্থনীতিগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলছে মুক্তবাজারের ধুয়া। কেবল পেপসি-কোকাকোলা, ম্যাকডোনাল্ড, প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বলরা দরিদ্র দেশগুলোর বাজার থেকে লুটে নিচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। মাঠে মারা যাচ্ছে ক্রেতা সাধারণ, দেশীয় ব্যবসায়ীরা। ফলে থেমে আসছে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নাড়ীর স্পন্দন। এই নির্লজ্জ লুণ্ঠনের কারণে আটলান্টিকের এপাড় হ’তে ওপাড় অবধি শোনা যাচ্ছে পুঁজিবাদের আর্তচিৎকার, প্রচণ্ড পতন ধ্বনী। ওয়ালস্ট্রিটের কোলাহল থেমে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির মোড়ল মাতব্বররা হতবিহ্বল। সব থেকে মজবুত অর্থনীতি সবার আগে তাই ভেতর থেকেই ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদের বিনাশ, বিলুপ্তি।

বিশ্ব পুঁজিবাদের ‘বিগ ব্রাদার’ যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক তার ক্ষত স্থানগুলোতে পট্টি বাঁধছেই। কিন্তু তার রক্তক্ষরণ থামছে না। তারপরও তার যুদ্ধ উন্মাদনায় ক্ষ্যান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। যুদ্ধবাজ বুশের বিদায়ের পর বিশ্ব সম্প্রদায় আশা করেছিল এবার হয়তো বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করবে। রণাঙ্গনগুলোতে থেমে যাবে মারণযন্ত্রের দিগন্তভেদী আওয়াজ। দুর্বল জাতিসমূহ রেহাই পাবে। বন্ধ হবে গুয়ানতানামো ও আবু গারীব আর আফগানিস্তানের গোপন কারাগারসমূহ। মার্কিন জনগণ কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামাকে হোয়াইট হাউসে এনেছে শান্তির প্রত্যাশাতেই। কিন্তু প্রশাসনের কর্মকৌশল বিশ্ববাসীকে হতাশ করছে বৈকি। মার্কিনী জনগণও নিশ্চয়ই বিস্মিত। যুদ্ধের দামামা থামবার কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। রণোন্মাদনার কোন কমতি চোখে পড়ছে না। মার্কিনীরা এক সময় যুদ্ধ করেছে

একটি 'মুক্তবিশ্ব' (ফ্রি ওয়ার্ল্ড) প্রতিষ্ঠার পক্ষে, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য, কমিউনিস্ট জুজুর বিরুদ্ধে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, কিমবাদের বিপক্ষে। এজন্য তখন গড়ে তুলেছিল ন্যাটো প্রভৃতি যুদ্ধবাদী জোট। সোভিয়েতের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা খুঁজতে থাকে নয়া ছল-বাহানা, যুদ্ধ আগ্রাসনের নতুন ছুঁতো। এজন্য নব্বইয়ের দশকে এরাই হাযির করে 'সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব' (স্যামুয়েল হান্টিংটন)। আরো পরে এরই আবডালে এরা খুঁজে পায় 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' এক মোক্ষম ডকট্রিন। আগে যুদ্ধ ছিল কাস্তে হাতুড়ির বিরুদ্ধে, এবার যুদ্ধ হচ্ছে চাঁদ-তারার বিরুদ্ধে। আগে যুদ্ধ ছিল কমরেডদের বিরুদ্ধে, এবার 'সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে। এবারের যুদ্ধ মৌলবাদ জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে, আর ওরা লড়ছে ক্রুসেড। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আশা করেছিল জর্জ বুশের প্রস্থানের পর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অবসান হবে। পরিত্যক্ত হবে জঘন্য এই ভুয়া দর্শন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরো আঠার মাস মার্কিন বাহিনী থাকছে ইরাকের মাটিতে। আরো ১৭ হাযার মার্কিন সৈন্যের বহর পৌঁছে যাচ্ছে আফগানিস্তানে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করা হয়েছে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, ওয়াজিরিস্তান, হুঞ্জা, সোয়াত এখন একেকটি নয়া ফ্রন্ট। ইতিমধ্যে মার্কিন ড্রনের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হয়েছে প্রায় চারশ' সাধারণ পাকিস্তানী, ধ্বংস হয়েছে অনেক স্থাপনা, জনপদ। বিপুল অর্থ ব্যয় করে মানুষ হত্যা, সম্পদ ধ্বংস করার এসব নয়া কর্মসূচী চালু রেখেছে মার্কিন প্রশাসন। বিগত ৭ বছরে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আফগানিস্তানে। এর সঙ্গে যুক্ত হল পাকিস্তানের এসব রণাঙ্গন। বিপুল অর্থব্যয় করে চালানো হচ্ছে তালেবান, আল-কায়েদা বিরোধী যুদ্ধ। কিন্তু সামান্যই সাফল্যের মুখ দেখেছে মার্কিন/ন্যাটো বাহিনী। দক্ষিণের কান্দাহার, পূর্বের নানগারহার অঞ্চলে এখনও কর্তৃত্ব তালেবানদেরই।

আফগান দখলদার বাহিনীর (ন্যাটোর) কমান্ডার ইন-চিফ টমি ফ্রাঙ্ক তো বলেই ফেলেছেন যে, এ যুদ্ধে বিজয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে প্রতিদিনই যুদ্ধ হয়ে উঠছে অসম্ভব, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা হয়ে উঠছে অদম্য। তবু যুদ্ধের জন্য আরো সৈনিক পাঠানো হচ্ছে। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস বলেছেন, আফগানিস্তানে যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়া হবে। সেই সাথে ওবামা হুঙ্কার দিয়েছেন আল-কায়েদা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলবে যুদ্ধ। মার্কিনী সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সমুন্নত রাখতে যা যা করা দরকার তাই করা হবে।

কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা খরচা করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। আফগান পুলিশ বাহিনী গঠন করতে ইতিমধ্যে অনুদান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ মিলে দিয়েছে তিন বিলিয়ন ডলার। আর আফগান সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য চার হাযার প্রশিক্ষক পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার (!) স্বার্থেই এর ব্যয়ভার বহন করবে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আফগানিস্তানে (এবং অন্যান্য দেশে) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিকাদারি যুক্তরাষ্ট্রকে কে দিয়েছে? গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার জন্য যুদ্ধ ঘোষণার কথা কোন কেতাবে লেখা আছে? তেমনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সহযোদ্ধা পাকিস্তানকেও দিচ্ছে সাত বিলিয়ন ডলারের অনুদান। আর তাঁবেদার মোশাররফ-জারদারীরা খুশীতে ডগমগ হয়ে নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে, যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। জেনারেল কায়ানীরা বোমা ফেলছে নিজেদের ভূখণ্ডেই, ধ্বংস করছে নিজেদের দেশ, জনগণকে। এভাবে যুদ্ধ ও ধ্বংসের জন্য, মানবতাকে নিষ্পিষ্ট করতে দেদারসে টাকা ঢালছে মার্কিনীরা।

তাদের এই যুদ্ধ-অর্থনীতি কেবল এক দেশের নয় বা একদিনের নয়। সাত দশক ধরে চলছে নানান দেশে মহাদেশে। কোরিয়া ভিয়েতনাম হ'তে কম্বোডিয়া হয়ে ইথিওপিয়া, সুদান, এঙ্গোলা, পানামা, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, হাইতি, কিউবা, চিলি হয়ে ইয়েমেন, লেবানন, ইসরাঈল, প্যালেস্টাইন, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে মার্কিনীরা তাদের অক্টোপাসের বাহু বিস্তার করেছে। মার্কিনী জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলছে প্রকাশ্যে-গোপনে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভয়ানক যুদ্ধ। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলকে যুগযুগ ধরে সামরিক খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের শায়েস্তা করতেই এই বিপুল অপচয়। এসব হচ্ছে যুদ্ধের রাজনীতি, যুদ্ধের অর্থনীতি।

পাক-আফগান দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলে তালেবান আল-কায়েদারা দুর্মর ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তাদের ধ্বংস করা চাই, হুংকার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। খাইবারপাস এখন বিপদসঙ্কুল পথ। পাকিস্তান হ'তে যুদ্ধের মালসামানা আনা-নেয়া করা ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারী রাখতে তারা নতুন স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছে। কাজাকিস্তান হ'তে উজবেকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান পর্যন্ত দীর্ঘ ব্যয়বহুল নয়া ম্যালিটারি সাপ্লাই রুট চালু করছে ন্যাটো বাহিনী। তালেবান/আল-কায়েদা নির্মূলের জন্যই এই রণসজ্জা এবং এই বিপুল অর্থ ব্যয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এই সর্বনাশা অনুশীলনে যোগ দিয়েছে মার্কিন বন্ধু ব্রিটেন, জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশ। এরা একযোগে হিংস্রতা ও ধ্বংসের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করেছে। নর হত্যা ও লুণ্ঠনের উন্মাদনায় বেপরোয়া। আর তাতেই পুঁজিবাদেরও নাভিশ্বাস দশা। বিগ ব্রাদার যখন হাটু ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, তখন তার সাগরেদরাও যে ধরাশায়ী হবে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল 'নিউ ডীল' মুভমেন্টের প্রবক্তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবথেকে ক্ষমতাধর, সম্পদশালী রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি প্রোগ্রামের সংগঠকরা স্বপ্ন দেখছে একুশ শতকের বিশ্ব তাদের মুঠোয়। এই সব তত্ত্বদর্শনের অনুসারী কর্মী ও পণ্ডিতবর্গের নিরন্তর যুদ্ধ আগ্রাসনের পক্ষে। শ্রেষ্ঠত্বমন্যতার ধারক মার্কিন শাসকবর্গও ঢালছে অঢেল অর্থ রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে। আর দিনকে দিন নাজুক হয়ে পড়েছে মার্কিন অর্থনীতির ভিত। গত দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার প্রায় শূন্য। বিদেশী বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের জন্য সচল থেকেছে রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনীতি। সাধারণ মানুষের আয় কমেছে, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের চাপে কলকারখানায় লক-আউট। তবুও যুদ্ধ তারা চাই।

এই সব যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার পশ্চিমি মিত্ররা কখনোই জয়ী হ'তে পারবে না। কেননা এসব যুদ্ধ অনৈতিক, অমানবিক, কোন যৌক্তিক ভিত্তিও নেই। তবু এসব যুদ্ধের বাবদে মানুষ ও মানবতা হত্যা করতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অপচয় করা হচ্ছে। এই সব অন্যায় যুদ্ধের দামে এখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বড় বড় কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। থেমে যাচ্ছে কলকারখানার চাকা। কিন্তু ইতিহাসের চাকা থেমে নেই, ঘুরছেই। পুঁজিবাদ এসব অনৈতিকতা, হিংস্রতা ও লালসার পিচ্ছিল পথ ধরে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজ দার্শনিকদের এমন অভিমত যে, পুঁজিবাদের অবধারিত নিয়তি হচ্ছে তার অবক্ষয় ও বিলুপ্তি। কালের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একসময় সেই নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যুদ্ধবাজ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবর্গের যুদ্ধংদেহী কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদের সেই অনিরুদ্ধ পরিণতিকে জলদি কাছে ডেকে আনছে, পতন ও ধ্বংসকে তরান্বিত করছে। যুদ্ধ অর্থনীতিই যুক্তরাষ্ট্রকে মহামন্দার দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। সর্বাগ্রে ধসে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রই। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে মন্দার ভাইরাস আক্রমণ হয়েছে তা দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এ মহামন্দা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। আইএমএফ-এর প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিশ্ব এখন দ্রুত এক বিপদজনক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ মহামন্দার বিস্তার যেমন ধনী দেশগুলোকে কাবু করে ফেলেছে, তেমনি এর ভয়ানক প্রভাব পড়ছে উন্নয়নশীল, দরিদ্র জাতিসমূহের উপর। অতি শীঘ্রই বিশ্বে অন্তত ৫০ মিলিয়ন লোক বেকার হয়ে পড়বে। বেড়ে যাবে খাদ্য ও চিকিৎসা সংকট। দেশে দেশে গৃহহীন হয়ে পড়বে লাখ লাখ মানুষ। বাড়বে শিশু মৃত্যুর হার, কমে যাবে মানুষের গড় আয়ু। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে বেড়ে যাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সৃষ্টি হ'তে পারে ব্যাপক সংঘাত ও নৈরাজ্য। এ মহামন্দা এক ভয়ানক সুনামীর মত ধেয়ে আসছে। তছনছ করে ফেলবে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে কলকারখানা, বন্দর বাজার। আর রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে আসন্ন হয়ে উঠতে পারে সমাজ বিপ্লব।

॥ ৪ ॥

বিগত ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দার পর এবারই সব থেকে গভীর বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে পুঁজিবাদ। নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগেও একবার মন্দার লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রেই এই সঙ্কটের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সে বারের প্রচ্ছন্ন মন্দা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সুবাদে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। সে সময় বিখ্যাত মার্কিন সাময়িকী The Economist (October, 1994)-এ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আসছে ২৫ বছরের মধ্যেই বিশ্ব এমন পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, যাতে নয়া অর্থনৈতিক দৈত্যের আবির্ভাব ঘটবে। আর সেই পরিবর্তন বিনা দ্বন্দ্বে মীমাংসা হবে না। পনের বছরের মাথায় কথিত সে দৈত্যই (মহামন্দা) নখরদন্ত প্রকটিত করে এগিয়ে আসছে। এর মীমাংসা কিভাবে হবে কে জানে!

এই মহাসঙ্কট থেকে উত্তরণ ও পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন ঠেকাতে দেশে দেশে চলছে দেন দরবার, দুতিয়ালী। আয়োজন করা হচ্ছে সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি। লন্ডনে বসেছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। এই ধনাঢ্য বিশটি দেশের দখলে রয়েছে বিশ্বের ৮০% সম্পদ। তার পরও তাদের এহেন দুর্যোগ-দুর্দশায় হাবুডুবু খাওয়া। আপতিত বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে পুঁজিবাদের এই রক্ষক-ভক্ষকরা। তারা গ্রহণ করতে চাইছে কোন সম্মিলিত কর্মসূচী। এরা ঐক্যবদ্ধ হ'লেই যে পুঁজিবাদের এই সংকট কেটে যাবে, ধস ঠেকানো যাবে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ নিজ সমস্যা সংকট। তবুও তারা ১ ট্রিলিয়ন ডলারে 'বেইল আউট' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যথেষ্ট মতানৈক্যের মধ্যেও। যুদ্ধ আগ্রাসন, মুক্তবাজার অর্থনীতির কপটতা, অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও বিশ্বায়নের দাপট পুঁজিবাদকে এই দশায় এনে উপনীত করেছে। এসব শুধরে নিতে পারলে হয়ত কিছুকালের জন্য পুঁজিবাদ টিকে যেতে পারে। কিন্তু তার অন্তর্গত পচনকে রোধ করা যাবে না।

পাঁচশত বছর ধরে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পুঁজিবাদ বুড়িয়ে গেছে, এখন ক্লান্ত, অন্তসারশূন্য। দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষায়। যুদ্ধ অর্থনীতির ফলে কেবল যুক্তরাষ্ট্রই নয় তার মিত্ররাও কমবেশী ফেঁসে গেছে। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের অর্থনীতি পুঁজিবাদকে ভিতরে ভিতরে ধসিয়ে দিয়েছে, তার নৈতিক শক্তিকে যেমন ক্ষয় করে ফেলেছে তেমনি তার বাণিজ্যিক/বাজার সম্ভাবনাকে ভঙ্গুর করে তুলেছে। পরিত্রাণের পথ অবরুদ্ধ প্রায়।

প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে বার বার বুম এন্ড বাস্ট-এর চাকায় চড়ে পুঁজিবাদ এখানে এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ

Contents

পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। এই আর্থ-সামাজিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বুমের পোটেনশিয়াল ফুরিয়ে এসেছে। ৮০ বছর পূর্বেকার মহামন্দার (১৯৩০) আবর্ত থেকে কোন মতে উঠে আসতে পারলেও এবার সে সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে উঠছে। বোনাস, ভর্তুকি, ট্যাক্সকাট, সূদের হার হ্রাস, বেলআউট কোন কিছু দিয়েই ধরাশায়ী পুঁজিবাদকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। কিভাবে প্রতিরোধ করবে এই প্রবল ভাঙ্গনকে? কি বিকল্প আছে এর সামনে? কিভাবে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের তাণ্ডবতা, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজারের উদগ্র লালসার মধ্যে পুঁজিবাদের ধসকে সামাল দিবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা? যুদ্ধবাজ যুক্তরাষ্ট্র ও তার পুঁজিবাদী মিত্রবর্গ কিভাবে বের হয়ে আসবে 'রিসেশন' নামক এই গডজিলার থাবা থেকে? কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে বিশ্ব সম্প্রদায়? এর জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন খ্যাতিমান মার্কিন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর এমিরিটাস রবার্ট হেলব্রনার। তিনি পথ বাতলে দিয়েছেন: In this fateful dram consideration of politics and culture are likely to play a more determinative role than any choice economic instrumentalitya. এ বক্তব্যের মর্মবাণী সম্ভবতঃ এই যে, কোন অর্থনৈতিক কারসাজি করে এই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না, বরং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক উদারতা ও সহনশীলতাই এ ক্ষেত্রে নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। জাতিসমূহের উপর দখলদারিত্ব বা সাংস্কৃতিক অবদমন নয়, তাদের নিজস্ব অস্তিত্বের স্বীকৃতি দান ও সাংস্কৃতিক মুক্তিই হ'তে পারে উত্তম পন্থা। অর্থাৎ জাতিসমূহকে নিজের মতো করে চলার, ভাগ্য গড়ার সুযোগ দিতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে আগ্রাসন ও চাপিয়ে দেয়ার নীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বোধদয় হবে কি-না কে জানে? তার পুঁজিবাদী মিত্ররাও নিজেদের শুধরে নিবে কি-না কেউ বলতে পারে না। পাশ্চাত্যকে নিরাপদ রাখার এবং মুক্ত বাজারের নামে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে প্রবল অভিক্ষেপ, অশান্তি। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার তীর আবার তাদের নিজেদের দিকেই ছুটে আসছে। ছত্রখান করছে তাদের নিজেদের সমাজ ও রাজনীতিকেও। যুক্তরাষ্ট্রই এর প্রধান প্লেয়ার এবং মূল অকুস্থল। তাই নিজেদের রক্ষা করতেই পশ্চিমকে বেরিয়ে আসতে হবে চলমান যুদ্ধ আগ্রাসন, লুণ্ঠন, দখলদারিত্বের নষ্ট আবর্ত হ'তে। জিঘাংসা, পরধর্ম বিদ্বেষ ও আগ্রাসনের অগ্নীবলয় হ'তে। একুশ শতকেও বন্দুকের নলের মাথায় বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধকে বাণিজ্যিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা শুধু অনৈতিক নয়, অপরাধও। যুক্তরাষ্ট্র যদি এখনও সামরিক সংঘাত ও আগ্রাসনের নেতৃত্ব দিতেই থাকে তবে শুধু মহামন্দা গভীরতর হবে তাই নয়, হোয়াইট হাউজ পেন্টাগণ থেকে অন্যত্র সরে যেতে পারে বিশ্বক্ষমতার ভরকেন্দ্র।

পুঁজিবাদের এই ভাঙ্গনের কোলাহলের মধ্যে পাশ্চাত্যের আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থাটি হচ্ছে ইসলামের সাথে সমঝোতা করে নেয়া। ইসলামের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, নয় কোন নয়া ক্রুসেড। ইদানিং নানা নামে নানা বাহানায় মুসলিম জাহানের সাথে বিরোধ বিসম্বাদ করে পাশ্চাত্য কেবল তার অর্থনৈতিক শক্তিকেই অপচয় করছে না, নৈতিক-আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকেও ধ্বংস করে ফেলছে। জঙ্গীবাদ সন্ত্রাসবাদের জিগির তুলে বিভেদ, বিদ্বেষ ও সংঘাতের ধূম্রজাল বিস্তার করছে। তালেবান, আল-কায়েদা, হিযবুল্লাহ, হামাস, ফিদাইন, জিহাদী নানান নামে বস্তুত বিশ্ব জুড়ে হানাহানিতে ইন্ধন দিয়ে চলেছে পশ্চিম। এখন বহু মানুষ মনে করেন কথিত জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ নিজে কোন সমস্যা নয়। এটা হচ্ছে প্রকৃত সমস্যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া মাত্র। বিগত কয়েক দশক ধরে দেশে দেশে পাশ্চাত্য ও তার দেশীয় এজেন্টরা মুসলমানদের নানাভাবে যুলুম, অপমান, হয়রান, পীড়ন, বঞ্চনা করে চলেছে। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে করা হয়েছে উপেক্ষা। তাদের কথা শুনতে নারাজ প্রতিপক্ষ। কথিত জঙ্গীবাদ হচ্ছে এসবেরই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ, লক্ষ্য হাসিলের ক্রুদ্ধ প্রয়াস। কাজেই পশ্চিমকে তার দর্শন বদলানো দরকার। এ সবের মূল কারণ খোঁজা দরকার, প্রয়োজন সমস্যার নিরসন। তাহ'লে আপনা থেকে এসব মিলিয়ে যাবে। এ সবের সামরিক সমাধান খুঁজবার চেষ্টা হ'তে পারে নিষ্ফল ও ভয়ঙ্কর। তাই ইসলামকে ঠেকানো নয়, প্রয়োজন ইসলামের সাথে সংলাপ ও সমন্বয়ের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি ইরানের নওরোজ উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে প্রেসিডেন্ট ওবামার যে মনোভঙ্গি ও অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তা প্রশংসার্হ। তার আহ্বান যদি আন্তরিক হয়, তবে সেখান থেকেই 'নতুন যাত্রা' আরম্ভ হ'তে পারে, শুরু হ'তে পারে কূটনীতি ও সমঝোতার এক নয়া যুগ। দূরত্ব ও বৈরীতা মুছে ফেলে, সংঘাতের পথ থেকে ফিরে, শান্তির মঞ্জিল অভিমুখে পথ চলা শুরু হ'তে পারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের তালিবানদের সাথেও ডায়ালগের আভাস দিয়েছে হোয়াইট হাউস। সম্ভবতঃ যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে আসতে চাইছে আফগানিস্তান থেকে। বলা হচ্ছে, ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কথাও। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে প্যালেস্টাইনিদের। এসব প্রস্তাবনা, মহৎ ভাবনা যদি বাস্তবে রূপলাভ করে তাহ'লে যুদ্ধ-অর্থনীতির পাট চুকে যেতে পারে। খুলে যেতে পারে বিশ্বশান্তির বিশাল দরজা। উদ্বোধন হ'তে পারে মুসলিম বিশ্বের সাথে পাশ্চাত্যের সমঝোতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নবযুগের।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীলঙ্কার সামনে নতুন লড়াই

শরীফুল ইসলাম ভূঁইয়া

শ্রীলঙ্কাকে আপাতত তামিল গেরিলাদের তৎপরতা থেকে মুক্ত বলা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তামিল এলাকায় গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাদের জয় ঘোষণা ও গেরিলাদের পরাজয় মেনে নেওয়ার পাট আগেই চুকে গিয়েছিল। বাকী ছিল শুধু তামিল নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের শেষ পরিণতি ঘটা। এতেও সময় লাগেনি। গত ১৮ মে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ঐ 'সূর্যের' পতন ঘটেছে তামিল এলাকায়। এ সূর্যহীন আঁধারে এখন সন্ত্রাসের ওঁৎ পাতা ভীতি নেই, আছে এক ধরনের 'শান্তির' সুনসান নীরবতা। এ কারণেই গত ১৯ মে জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন, 'এই দিনটি শুধু শ্রীলঙ্কার জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ'।

একই সঙ্গে রাজাপক্ষে দেশে টানা ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ও গেরিলাদের সহিংসতা থেকে মুক্তির কথা ঘোষণা করেন, আর ডাক দেন জাতীয় ঐক্যের। তিনি বলেন, 'দেশে এ গৃহযুদ্ধের অবসানে আমরা সেনা অভিযানের যে উপায় বের করি, তার কোন বিকল্প ছিল না। আর এ সমাধান সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে'।

এলটিটিইকে যারা খুব ভালভাবে চেনে ও জানে, প্রভাকরণ ও তার গেরিলাদের পতনের ঘটনা তাদের পক্ষে যেন বিশ্বাস করাই কঠিন। একসময় বিশ্বজুড়ে একটা ধারণা পোক্ত হয়েছিল যে, এলটিটিই একটি অজেয় শক্তি। এর কোন পতন নেই। তবে এ গৃহযুদ্ধ দেশবাসীর কাছ থেকে কম মূল্য আদায় করেনি। আড়াই যুগেরও বেশী সময় ধরে চলা এ যুদ্ধে ৭০ হাযার লোক প্রাণ হারিয়েছে। ঘর ছাড়া হয়েছে হাযার হাযার মানুষ। একই সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি ও সংখ্যালঘু তামিলদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা তীব্রতর হয়েছে। প্রভাকরণের মৃত্যুতে শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে এক ঘটনাবহুল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

পতনের কারণ

প্রভাকরণের নিজের অতি আত্মবিশ্বাস ও তার কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পতন হয়েছে এলটিটিইর। তার কিছু সিদ্ধান্ত হঠকারিতার শামিল। বিশ্লেষকদের মতে, প্রভাকরণ সবচেয়ে বড় ভুলটি করেন আত্মঘাতী হামলাকারী পাঠিয়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীকে হত্যা করে। এতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারতের চোখে এলটিটিই শুধু একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবেই কালিমালিপ্ত হয়নি, সে দেশের চিরশত্রু বনে যায়। এতে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে এলটিটিইর সমর্থনের মূল ভিত নড়ে ওঠে। একই সঙ্গে তাদের সামরিক নেটওয়ার্কও বড় বাধার মুখে পড়ে। প্রভাকরণের এ ভুল থেকে বাড়তি ফায়দা হিসাবে কলম্বো ও দিল্লীর মধ্যে সেনা সহযোগিতা জোরদার হয়।

প্রভাকরণের আরেকটি বড় ভুল হচ্ছে ২০০২ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির বরখেলাফ। এ চুক্তির মাধ্যমে এলটিটিই সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করে একটি আপসরফায় পৌঁছতে পারত। এতে লক্ষ্য হাছিলে পুরোপুরি সফল না হ'লেও তামিলরা নিজ এলাকায় শান্তিতে বাস করতে পারত। তা না করে এলটিটিই এ চুক্তিকে ভঙ্গ করে গোপনে অস্ত্র তুলে নিয়ে দলকে পুনর্গঠন করে। এতে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার পরিণামে যে যুদ্ধ শুরু হয়, পরিণামে তা এলটিটিইর সর্বনাশ ডেকে আনে।

প্রভাকরণের নির্দেশে এলটিটিইর গেরিলারা গলায় মারাত্মক বিষ সায়ানাইডের ক্যাপসুল ঝুলিয়ে রাখত। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, ধরা পড়ার মতো বিপদ দেখা দিলে এ বিষ গিলে আত্মহত্যা করতে হবে। এ কারণে এলটিটিই গেরিলাদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি হয়। সবার কাছে তারা বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়। এ ভয় ও ঘৃণা ক্রমে এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ৩২টি দেশ এলটিটিইকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে ঘোষণা দেয়। বলা হয়ে থাকে, গেরিলা হামলায় আত্মঘাতী হামলার অন্যতম নকশাবিদ প্রভাকরণ। শত্রু ঘায়েলে তাঁর এ নীতিও বিভিন্ন দেশে নিন্দার ঝড় তোলে। এসব কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এলটিটিইর তহবিল সংগ্রহ বাধার মুখে পড়ে। এছাড়া তাদের তহবিল জোগাড়ের বড় দুটি উৎস মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ও অস্ত্রের চোরাকারবারীও ইদানিং সংকুচিত হয়ে আসে।

এলটিটিইর অভ্যন্তরীণ কোন্দলও তাদের পতনের অন্যতম বড় কারণ। বিভিন্ন সময়ে এলটিটিইর একাধিক নেতা দলছুট হয়ে নিজেরা আলাদা দল গড়েন, নয়তো সরকারের সঙ্গে হাত মেলান। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঝামেলা করেন সাবেক পূর্বাঞ্চলীয় নেতা কর্নেল করুনা। ২০০৪ সালে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি এলটিটিইর জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনেন।

যেভাবে পতন হ'ল

প্রভাকরণের পতনে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের। ২০০৫ সালে ক্ষমতায় এসেই গেরিলাদের ব্যাপারে তিনি শক্ত অবস্থান নেন। পরিকল্পনা নেন শুধু দমন নয়, একেবারে নির্মূল করে ছাড়বেন গেরিলাদের। তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সেনা অভিযান

চালানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ এলটিটিই শিগগিরই সে সুযোগ হাতছাড়া করে দেয়। ২০০৬ সালের জুলাইয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় মাভিল অরুর স্লুইসগেটগুলো তারা বন্ধ করে দেয়। এতে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী সেনাবাহিনী গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর একটি বড় সুযোগ পায়।

দফায় দফায় সেনা অভিযানে একের পর এক এলাকা হাতছাড়া হ'তে থাকে গেরিলাদের। ২০০৭ সালের জুলাই থেকে প্রথমে পূর্ব ও পরে উত্তরাঞ্চলের দখল হারায় গেরিলারা। এ বছরের শুরু থেকেই সেনারা সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। এতে জানুয়ারীতে বহুল আলোচিত কিলিনোচ্চতে গেরিলাদের রাজনৈতিক সদর দপ্তরের পতন ঘটে। পরে 'এলিফ্যান্ট পাস' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পথও তাদের হাতছাড়া হয়। তারপর মুল্লাতিভুতে গেরিলাদের শক্ত ঘাঁটিও ধূলিসাৎ হয়। শেষ পর্যায়ে উপকূলীয় এলাকায় এক চিলতে জঙ্গলে জায়গায় গেরিলারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সম্প্রতি তারা সে আশ্রয়ও হারায়।

সামনে নতুন লড়াই

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এলটিটিইর পতন ঘটেছে বলেই শ্রীলঙ্কার সরকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোন কারণ নেই। গৃহযুদ্ধের কারণে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। এর মধ্যে বিশ্বমন্দার প্রভাব তো আছেই। শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, সে দেশে মানবিক সংকটের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। সেনা ও তামিল গেরিলাদের মধ্যে লড়াই চলাকালে সমর এলাকায় আটকে পড়া হাযার হাযার বেসামরিক তামিল নাগরিককে উদ্ধারে সরকার কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি তারা আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোকেও উদ্ধারকাজে অংশ নিতে দেয়নি।

শ্রীলঙ্কা সংকট মোকাবিলায় ভারত, পাকিস্তান, ইরান ও জর্ডানের মতো মিত্র দেশগুলোর সহযোগিতা কামনা করছে। গত বছর শ্রীলঙ্কার প্রধান তেল সরবরাহকারী দেশ ইরান তাদের জন্য ১০০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। কিন্তু তাদের আরও ঋণ চাই। রাজাপক্ষে সম্প্রতি লিবিয়া গিয়ে ৫০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করেন। আর সে দেশে বসেই তিনি প্রথম গেরিলাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ঘোষণা দেন। গৃহযুদ্ধ অবসানে শ্রীলঙ্কার সরকার এখন ঝামেলামুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গন এখন দেখবে বিদ্যমান মানবিক সংকট তারা কিভাবে মোকাবিলা করে? উদ্বাস্তু বেসামরিক তামিলদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলাই হবে এখন তাদের নতুন যুগ।

॥ সংকলিত ॥

জনমত কলাম

ইতিহাস থেকে তাদেরকে মুছে ফেলতে হবে!

মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা ভুঁইয়া

গত ২১ মার্চ দৈনিক সমকাল ১৪ পৃষ্ঠায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান স্বপ্ন রচিত 'জাতীয় কবরস্থানে স্বাধীনতা বিরোধীর কবর' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লাম। প্রতিবেদক তার লেখার সাথে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডঃ এস.এ. হাসান এর প্রায় অভিন্ন মতামতও যুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদক তার লেখায় জাতীয় কবরস্থানে মুসলিম লীগের এম.এ. সবুর (শুদ্ধ নাম হ'ল: খান এ সবুর) কে কেন সমাহিত করা হয়েছে (?) এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের অনেক নেতার বিরুদ্ধে আমরা ঢালাওভাবে 'স্বাধীনতা বিরোধী' বা 'পাকিস্তানের দালাল' বলে অভিযোগ উত্থাপন করি। কিন্তু এই অভিযোগগুলোর পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি উত্থাপন করতে পারি না। অথচ স্বাধীনতার পর প্রায় সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। তখনও উল্লিখিত অভিযোগগুলো প্রমাণ করা যায়নি। একমাত্র বঙ্গবন্ধু ব্যতীত আওয়ামী লীগের সকল নেতা, মন্ত্রী ও এমপি ছিলেন ভারত প্রত্যাগত। তারা কেউ পাকিস্তানী ছিলেন না। তারপরও স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সরকার গঠন করার পর আমাদের উচ্চারিত 'কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধী' বা 'পাকিস্তানের দালাল' নামে অভিহিত ব্যক্তিদের বিচার করতে পারেনি অথবা করেনি।

এ প্রসঙ্গে ডঃ এম.এ. হাসান উক্ত সমকাল পত্রিকায় মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, 'জেল থেকে খান এ সবুর ও শাহ আজিজুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু মুক্ত করে এনেছিলেন'। ডঃ এম.এ. হাসান হয়ত পরের তথ্যটুকু জানেন না যে, জেল থেকে মুক্ত করার পর খান এ সবুরকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনসহ খুলনার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। শুধু তাই নয়, জেল থেকে মুক্ত করার পর খান এ সবুরের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎ করেছেন। উভয় নেতা দূতের মাধ্যমে অথবা ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। খান এ সবুরের কাছ থেকে দেশ পরিচালনায় দু'চারটি বিষয়ে মতামতও নিতেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু কেন?

১৯৪৪-৪৫ সালের অখণ্ড বাংলার অন্যতম ছাত্র নেতা শাহ আজিজুর রহমান জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তাঁর

পরিবারকে বঙ্গবন্ধু প্রতিমাসে দশ হাযার টাকা করে পাঠাতেন। জেল থেকে মুক্ত করার পর শাহ আজিজুর রহমানকে কয়েক মাসের বাড়ী ভাড়াও বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। কিন্তু কেন? বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর এই বদান্যতা ও উদারতার বিষয়টি অনেকের কাছেই ব্যক্ত করেছেন। তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সরকারী দলীয় নেতা খান এ সবুরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের সখ্যতার বিষয়টি বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মহাসচিব আতিকুল ইসলামের কাছ থেকে জেনেছি। 'কুখ্যাত ও পাকিস্তানের দালাল' বলে আমাদের কর্তৃক অভিযুক্ত, ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল, তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর লাশ চট্টগ্রামে পাঠিয়েছেন এবং চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষাধিক লোকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযা এবং গহিরার পৈতৃক বাড়ীতে দাফন তদারকীর জন্য বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের তৎকালীন ডি.সি এ.বি চৌধুরীকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন?

উক্ত সমকাল পত্রিকায় শাহরিয়ার কবির দাবী করে বলেছেন যে, 'কুখ্যাত দালাল' এ.এস.এম. সোলায়মান (সভাপতি, কৃষক শ্রমিক পার্টি) কে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তিনি দাফন করতে দেননি। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির অন্ততঃ এ.এস.এম. সোলায়মানের লাশ দাফন করতে না দিয়ে মহান দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ মৃত্যুর পূর্বে বিভিন্ন সভায় এ.এস.এম. সোলায়মান অকপটে বলেছেন যে, 'স্বাধীনতার পর জেল থেকে বঙ্গবন্ধু আমাকে মুক্ত করেছেন। জেল থেকে বের হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় আমি মুজিব ভাইকে ফোন করলে তিনি আমাকে সেদিনই দেখা করতে হুকুম করলেন। আমি রাতে ধানমণ্ডির বাসভবনে দেখা করার পর আমাকে বাড়ি ভাড়া করে থাকার জন্য টাকা দিলেন। বেশ কিছুদিন পর ব্যবহারের জন্য আমাকে একটা পুরনো টয়োটা কার পাঠালেন'। কিন্তু কেন?

বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা কুমিল্লা শহরের বিখ্যাত দারোগা বাড়ির নূরুদ্দীন আবাদ মিয়া স্বাধীনতার পর কুমিল্লা কারাগারে অন্তরীণ থাকাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কুমিল্লা ছাত্রলীগের এক নেতার মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করতেন। ঐ ছাত্রলীগ নেতার মাধ্যমে আবাদ মিয়ার কাছে বঙ্গবন্ধু একবার টাকাও পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন?

গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানের দুই পুত্র খালেকুজ্জামান খান হুমায়ুন (পরে তিনি বাজিতপুর নিকলী এলাকা থেকে বাংলাদেশ সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন) ও সাইফুজ্জামান খান মাকসুদ স্বাধীনতার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা দু'ভাই জেল থেকে কি করে মুক্ত হয়েছিলেন এই বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে এক বিস্ময়কর ঘটনা জানতে পেরেছি, 'মুজিবর! মোনায়েম খানের দুই নাবালক পুত্রকে ঢাকা জেলে কেন আটক করিয়া রাখিয়াছ? তাদের ছাড়িয়া দাও'- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর এমন একটি চিরকুট পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাদের মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কেন?

এতোগুলো 'কিন্তুর' জবাব শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ড. এম.এ. হাসান ও আসাদুজ্জামান স্বপ্নকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই প্রয়োজনে। 'স্বাধীনতা বিরোধী' 'পাকিস্তানী দালাল' ইত্যাদি বিশেষণে যাদেরকে আমরা হরহামেশা অভিযুক্ত করছি সেই সকল 'কুখ্যাত' ব্যক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার পরও বঙ্গবন্ধু আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেন রক্ষা করতেন তা অবশ্যই নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে।

ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন শের-এ-বাংলা নগরের কবরস্থানে ১৯৮২ সালে সমাহিত খান এ সবুর এর কবরসহ কবরস্থানটি স্থানান্তরের পাশাপাশি খুলনার প্রধান সড়কটি খান এ সবুরের নামে থাকায় খুলনাবাসীর লজ্জিত হওয়া উচিত বলেও উল্লিখিত পত্রিকায় মত প্রকাশ করেছেন। আমি মুনতাসির মামুনের মতো ইতিহাসবিদ বা গবেষক নই। তবে কৌতূহল নিবৃত করাসহ কিছু কিছু বিষয়ে জানার জন্য চেষ্টা করি। যেমন- ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অকল্পনীয় গণ-সমর্থনের অধিকারী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দু'টি আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতার মাত্র সাত বছর পর ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে আমাদের ভাষায় 'কুখ্যাত' খান এ সবুর বৃহত্তর খুলনা যেলার তিনটি আসন থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা বিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত খান এ সবুর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তিনটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এমন হৃদয়বিদারক (?) ঘটনা বাংলাদেশে আরো ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরই অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাহক বলে দাবীদার আমরাই ইতিহাস থেকে জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীকে মুছে ফেলেছি।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময় বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলাম, যেখানে ২২টি রাজনৈতিক দলের নেতারা আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার জন্য বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মহাসচিব

Contents

আতিকুল ইসলামকে আহ্বান করার পূর্বে বঙ্গবীর একটি ছোট্ট ভূমিকায় বলেছিলেন, 'নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আমাদের পূর্ব পুরুষরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৭১ সালে মুসলিম লীগের কোন নেতা-কর্মী পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী থাকলে আমি এই বিষয়টিকে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস বলেই বিবেচনা করি। কারো বিশ্বাসের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করলেও ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ বা বিশ্বাসীদের ঘৃণা বা শত্রু মনে করাকে রাজনৈতিক উদারতার পরিপন্থী বলে মনে করি। মুসলিম লীগ দলগতভাবে অস্ত্র নিয়ে কখনো রাজনীতি করেনি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দলগতভাবে মুসলিম লীগ কোন বিশেষ বাহিনী সৃষ্টি করে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে তেমন তথ্য আমার জানা নেই। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন ব্যক্তি বা দল যদি নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, মা-বোনদের নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মতো ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকে তাহ'লে তেমন ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আমি কখনো রাজনীতি করব না'।

দৈনিক সমকাল পত্রিকার একই তারিখে একই পৃষ্ঠায় গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদকের নামবিহীন ঐ প্রতিবেদনে গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানকে শহীদ বলা হয় বলে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে শাহরিয়ার কবির ও ড. এম.এ. হাসানও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর নিহত হওয়া পর্যন্ত আব্দুল মোনায়েম খান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কি কি ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছেন সে সম্পর্কে প্রমাণসহ কোন তথ্যই শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন বা ডঃ এম. এ. হাসান দেশবাসীকে জানাতে পারেননি।

অথচ আমরা যাকে 'পাকিস্তানী দালাল' 'স্বাধীনতা বিরোধী' এবং 'কুখ্যাত' বলে প্রতিনিয়ত গালি দিচ্ছি, পরলোকগত সেই মানুষটি সম্পর্কে স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, 'গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খান এর সঙ্গে আমার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহ ভক্ত। ছালাত-ছিয়ামে খুবই পাবন্দ ছিলেন। উনার বিরুদ্ধে বলার মতো কোন ঘটনা কোন সময় ঘটে নাই। উনি যে রাজনীতি করতেন তা সততা, নিষ্ঠা ও মনপ্রাণ দিয়েই করতেন আর উনি খুব সৎ ছিলেন। তাই একজন মুসলমান হয়ে অন্য একজন মুসলমান সম্পর্কে বলতে হ'লে খুব হুঁশিয়ার হয়ে বলতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে উনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম একজন মুরুব্বী হিসাবে।

ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত 'দীপংকর' (১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৭) নামের মাসিক পত্রে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (এ.আর. মল্লিক) এর 'উপাচার্য পদে চ্যালেঞ্জ' লেখাটি পড়েছি। লেখাটি গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খান সম্পর্কিত। ডঃ এ.আর. মল্লিক তাঁর লেখার কোথাও গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানকে 'কুখ্যাত' বা অন্য কোন বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করেননি; বরং প্রশংসাই করেছেন। খোঁজ খবর নিতে গিয়ে আরো একটি চমকপ্রদ ঘটনা জেনেছি। গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খানের দ্বিতীয় পুত্র এ.এইচ.এম. কামরুযযামান খান ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে সন্তোষ গিয়েছিলেন। আলোচনার মাঝে এক সময় মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'তোমার বাবা একজন ঈমানদার ও সৎ মানুষ। তিনি লাটভবনে (গভর্নর হাউজ) মদ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন কেন? তাঁহাকে রাজনীতি করিতে বলিবা। রাজনীতিতে তাঁহার মতো মানুষের দরকার আছে'।

১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক ঢাকায় গঠিত মুসলিম লীগ সম্পর্কে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম এর পর্যবেক্ষণজনিত মূল্যায়ন এবং গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর অর্থমন্ত্রী ডঃ এ.আর. মল্লিক এবং মযলূম জননেতা মাওলানা ভাসানীর মূল্যায়ন কিন্তু আমাদের উচ্চারিত ও ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং লালিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে আমরা কোন স্বার্থে মৃত এই সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামের সাথে এ ধরনের ন্যক্কারজনক লকব ব্যবহার করছি? ইতিহাস থেকে তাদের নাম মুছে ফেলাই কি মূল টার্গেট?

পরিশেষে বলব, দেশের রাজনীতির ইতিহাস ও রাজনীতিবিদ সম্পর্কে জানতে ইতিহাসের অলিগলিতে হাঁটতে শুরু করেছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ও ছাত্ররা। যে ইতিহাস আমরা বিকৃত করছি বা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছি তা যখন ভবিষ্যতে তাদের সামনে উন্মোচিত হবে, তখন আমাদের অনেককে নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে।

॥ সংকলিত ও সংক্ষেপায়িত ॥

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

চিকিৎসা জগত

কম্পিউটার ব্যবহারে ঘাড় ও পিঠ ব্যথায় করণীয়

বিশ্বকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার। আর মানুষকেও তথ্যের বন্ধনে কাছাকাছি নিয়ে আসছে এ বিস্ময়কর যন্ত্রটি। কিন্তু বিনিময়ে এটি মানুষের ঘাড়, কাঁধ ও পিঠের ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি জার্নালে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। দেহের উপরের অংশ-ঘাড়, কাঁধ, হাত ইত্যাদির ব্যথা ও শক্ত হয়ে যাওয়া আগে যতটা ধারণা করা হয়েছিল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মাঝে এখন তা অনেক বেশী মাত্রায় উপস্থিত। আর এর সমাধানও চমকপ্রদ। যারা গতানুগতিক ভাল কম্পিউটার ব্যবহার করে না, তাদের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা কম। এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয়:

* কম্পিউটারের কি-বোর্ডটিকে কনুই উচ্চতার চেয়ে নীচে রাখতে হবে। এর জন্য চেয়ারটাকে একটু উঁচু করে নিন এবং পা ভাঁজ করে রাখা থেকে বিরত থাকুন।

* কি-বোর্ডটিকে টেবিলের দিকে ঠেলে রাখুন, যাতে আপনার হাত ও বাহু কম্পিউটার টেবিলটিতে ওযন রাখতে পারে। প্রয়োজনে হাত ও বাহুর জন্য একটা আলাদা অংশ তৈরী করে নেয়া যায়। এতে হাত ও কাঁধের চাপ কমবে।

* কি-বোর্ডটি সরাসরি মনিটরের সামনে রাখুন, সামান্য অবনত দৃষ্টিতেই যেন আপনি কি-বোর্ডটি দেখতে পান মনিটরসহ। যদি মনিটরকে দেখার জন্য কোনদিকে বাঁকতে হয় তবে তা দেহের উপরের অংশের ব্যথার কারণ হবে।

* সামগ্রিকভাবে কাজের পরিবেশ যেন আপনার কর্মস্থলে ভাল থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সোয়াইন ফ্লু

সোয়াইন ফ্লু কী?

এটি এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। সোয়াইন অর্থ শূকর। শূকরের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটির জিনগত পরিবর্তন হয়ে তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাকে সোয়াইন ফ্লু বলা হয়।

যে জীবাণু দিয়ে হয়:

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দিয়ে ফ্লু হয়ে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে প্রায়ই জিনগত পুনর্বিন্যাস হয়ে ভাইরাসটির নতুন নতুন প্রকরণ তৈরী করে। এটি একটি আরএনএ ভাইরাস। জিনগত পুনর্বিন্যাসের কারণে ভাইরাসটির হিমাগ্লুটিনিন এবং নিউরামিনিডেজ নামক দুটি প্রোটিনে পরিবর্তন হয়।

কিভাবে ছড়ায়:

এটি সাধারণত হাঁচি, কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগের উপসর্গগুলো:

কাশি, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, মাথাব্যথা, মাংশপেশী ব্যথা হচ্ছে এ রোগের সাধারণ উপসর্গ।

আক্রান্ত রোগীর করণীয়:

আক্রান্ত রোগী হাঁচি-কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য চাকরি ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাত দিয়ে চোখ স্পর্শ করা যাবে না। এমনকি আক্রান্ত অবস্থায় অন্যের সাথে করমর্দন থেকেও বিরত থাকতে হবে।

অন্যদের করণীয়:

সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত দেশ থেকে আসা লোকদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকলে বা কাউকে আক্রান্ত রোগী হিসাবে সন্দেহ হ'লে মুখে এবং নাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। মুছাফাহা করলে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলা। অ্যালকোহলে ধুলে আরো ভাল হয়।

চিকিৎসা:

এন্টি ভাইরাল অ্যাসেল্টামিভির, জানাজিভির, টামিফ্লু, রেলেনজা ব্যবহার করা হয়। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল এবং শরীরে পানি ও আয়রণের ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন হয়। সঙ্গে উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

টিকা:

জিনগত পুনর্বিন্যাসের কারণে প্রত্যেকবার নতুনভাবে তৈরী হওয়া প্রকরণের জন্য নতুন সুনির্দিষ্ট টিকা তৈরীর প্রয়োজন। তাই সঙ্গে সঙ্গে এর টিকা পাওয়া অসম্ভব। কারণ টিকা তৈরী করতে সর্বনিম্ন আটাশ দিন সময় লাগে। ততদিনে মহামারী হয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।

[সংকলিত

ক্ষেত-খামার

ফল গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

জুনের ১ তারিখ থেকে শুরু হবে বৃক্ষরোপণ অভিযান। তাই এখনই নানা ধরনের ফল গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। আপনিও অল্প পরিসর জায়গায় ফলের বাগান গড়ে তুলতে পারেন। ফলের চাষ খুবই লাভজনক। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফল বিক্রি করে আয়-রোযগার করতে পারেন।

চারা নির্বাচন: যে কোন গাছের জন্য উৎকৃষ্ট জাতের স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত চারা নির্বাচন করে রোপণ করতে হবে। আমের বেলায় ভিনিয়ার কলম বা জোড়া কলমের চারা এবং বাতাবি লেবু ও পেয়ারার বেলায় গুটি কলমের চারা রোপণ করা উত্তম। অন্যান্য গাছের বীজের চারা এবং কলার সাকার বা তেউড় রোপণ করা হয়।

স্থান নির্বাচন: চারা রোপণের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করতে হবে। এর জন্য বসতবাড়ীর আশপাশের এমন স্থান নির্ধারণ করতে হবে যেখানে ঘরবাড়ি কিংবা অন্যান্য বৃক্ষের ছায়া না পড়ে বা পড়লেও অল্প সময়ের জন্য পড়ে।

চারা রোপণ দূরত্ব: চারা গাছ রোপণের বেলায় অবশ্যই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাগানে আমের চারা রোপণের সময় একটি থেকে অন্যটির রোপণ দূরত্ব হবে ৯ থেকে ১২ মিটার। তবে আমের লতা জাতের বেলায় রোপণ দূরত্ব ৪ মিটার বা ১৩ ফুট হলেই চলবে। গাছের প্রসারতা বিবেচনা করে চারা গাছ লাগাতে হবে।

উপযুক্ত সময়: বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের চারা রোপণের সবচেয়ে উত্তম সময় জুন-জুলাই মাস। তবে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে এপ্রিল-মে মাসেও চারা রোপণ করা যায়। এমনকি প্রয়োজনবোধে শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য যে কোন সময় এ কাজ করা যায়। কলা গাছের বেলায় মার্চ-জুন মাস উপযুক্ত সময়।

গর্ত খনন: অধিকাংশ ফল গাছের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার বা দুই ফুট ব্যাস ও সমান গভীরতাবিশিষ্ট গর্ত খনন করা ভাল। তবে কলা ও পেঁপের বেলায় ব্যাস একটু বেশী যেমন ৬৭ সেন্টিমিটার বা আড়াই ফুট গভীরতার একটু কম, যেমন ৫৩ সেন্টিমিটার বা পৌনে দুই ফুট আকারের গর্ত অধিকতর সুবিধাজনক। নারিকেলের জন্য ৭৫ সেন্টিমিটার ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত হ'লে ভাল হয়।

সার প্রয়োগ: গর্তের উপর ও নীচের অর্ধেকের মাটি তুলে গর্তের দু'পাশে দু'ভাগে রেখে দিতে হবে, যাতে পরে উপরের দিকের মাটি গর্তের নীচের ভাগে এবং নীচের দিকের মাটি উপরিভাগে দেয়া যায়। গর্তের মাটির সঙ্গে নিম্নলিখিত হারে সার মিশাতে হবে। এই সার বৃক্ষজাতীয় গাছের বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য। বৃক্ষজাতীয় ফলের চারা রোপণের গর্তে এবং পরবর্তীকালে প্রযোজ্য বার্ষিক সারের পরিমাণ (গাছপ্রতি), গাছের আকার-প্রকার, মাটির উর্বরতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেসব গাছ ছোট আকারের সেগুলোর বেলায় সারের পরিমাণ কম এবং বড় গাছের বেলায় বেশী হবে।

চারা রোপণ: চারা রোপণ করতে হবে বিকালে। রোপণের পর সেচ দিয়ে গর্তের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এরপর পরবর্তী সপ্তাহে প্রতিদিন চারার গোড়ায় সেচ দিতে হবে। উন্মুক্ত জায়গার বেলায় চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা: সময়মত চারার গোড়ার মাটি নিড়িয়ে কিংবা কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগাছা বাছাই করতে হবে। প্রতি বছর যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তার অর্ধেক গ্রীষ্মের শুরুতে এবং অপর ভাগ বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে। তবে গাছে ফল থাকাকালীন সার প্রয়োগ না করে ফল নামানোর পর সার প্রয়োগ করতে হবে। আম ও কাঁঠালের বেলায় এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রতি বছর সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এই সার গোড়ার চারপাশে বছরের পর বছর বৃহত্তর এলাকাজুড়ে হালকাভাবে কুপিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তারপর সেচ দিয়ে কয়েকদিন পর মাটির শুকনো বা জো অবস্থায় তা আবার হালকা করে কুপিয়ে মালচিং করে দিলে ভাল হবে।

ছাঁটাইকরণ: গাছ ছাঁটাইকরণ বৃক্ষজাতীয় গাছগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রথম কয়েক বছর এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন, যেন গাছের একটি করে প্রধান কাণ্ড ভালভাবে বেড়ে ওঠে। আম, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, বাতাবি লেবু ইত্যাদি গাছের গোড়া বা তার উপর থেকে একাধিক কাণ্ড বেরোনোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে ক্ষেত্রে একটি প্রধান কাণ্ড রেখে বাকিগুলো ছাঁটাই করে দিলে পরবর্তীকালে প্রতিটি গাছ বেড়ে উঠবে সুন্দর একটি ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে।

বাড়ির ছাদে বাগান করে স্বাবলম্বী শাহনাজ পারভীন

অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ঢাকা মহানগরীর দালান-কোঠা, বাড়ীঘর দিন-দিন বেড়েই চলেছে। একে একে শিল্পকারখানা, শপিংমল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ার ফলে সবুজের সমারোহ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। একচিলতে জায়গাও খালি নেই চাষাবাদের জন্য। তাই অনেকে বাড়ির ছাদকেই বেছে নিচ্ছেন চাষাবাদের কাজে। প্রচুর পরিশ্রম আর একাগ্রতা থাকলে প্রাণহীন দালানের ছাদকেও যে বৈচিত্র্যে রংয়ে সাজিয়ে সতেজ এবং প্রাণবন্ত করে তোলা যায় তার এক অনন্য উদাহরণ হচ্ছেন শাহনাজ পারভীন। তিনি একজন সফল ছাদ চাষী। উত্তর বাড্ডার তিন কাঠার চ-৬৬/১নং বাড়ির ছাদটিকে তিনি পরিণত করেছেন আকর্ষণীয় এক ঝুলন্ত বাগানে। নিতান্তই শখের বশে কয়েকটি ফুল ও ফলের চারা দিয়ে ২০০১ সালে শুরু করেছিলেন বাগানটিকে। সামান্য কয়েকটি চারায় তার মন ভরেনি। একে একে ফুল, ফল, সবজি ঔষধি এবং শোভাবর্ধনকারী ৪০ প্রজাতির প্রায় ৪০০ গাছ দিয়ে সাজিয়েছেন বাগানটি। প্রায় ৩০ জাতের ফল, ১৫ প্রজাতির সবজি, ১২ প্রজাতির ফুল এবং ১০ প্রজাতির ঔষধি গাছসহ অসংখ্য গাছ রয়েছে তার ছাদে।

আম, জলপাই, করমচা, লেবু, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, কলা, আঙ্গুর, জামরুল, বিলম্বি, আমড়া, কুল ইত্যাদি সব ফলই উন্নত জাতের। সবজির মধ্যে রয়েছে পুঁইশাক, ডাঁটা, দুধকচু, ধনিয়া, ঢেঁড়স, বেগুন, বরবটি ও করলা। গোলাপ, বেলী, মুসান্ডা, বাগান বিলাস, কাঁঠালী চাঁপা, কামিনি, চেরি, পাতাবাহার, মিরান্ডী, ব্লিডিং হাট ইত্যাদি দেশী-বিদেশী ফুল সত্যিই চিত্তাকর্ষক। থানকুনি, মতকুমারী, তুলসী, মেহেদি, পাথরকুচি ইত্যাদি ঔষধি গাছও শোভা পাচ্ছে বাগানে। কথা প্রসঙ্গে পারভীন জানান, মাত্র ৫ হাযার টাকা পুঁজি দিয়ে বাগানটি শুরু করেছিলাম। এ পর্যন্ত বাগান থেকে আয় হয়েছে প্রায় লাখ টাকার মতো। তিনি বলেন, ৩ কাঠার একটি ছাদের বাগান থেকে বছরে ২৫ থেকে ৩০ হাযার টাকা আয় করা সম্ভব।

ছাদে বাগানের প্রযুক্তিগত সহায়তা তিনি কোথায় পেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্থানীয় মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার গুলশানের এসএএও রণজিত প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

জাগরণ

*-ডাঃ আব্দুল মজীদ**
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

হে মুসলিম! তুমি বিশ্ববিজয়ী নিখিলের উস্তাদ
তবে কেন হেন দুর্দশা হেরিতেছ তুমি আজ?
ইউরোপ যবে জ্ঞানের অভাবে তিলে তিলে হ'ত ক্ষয়
প্রদানিলে তাদের জ্ঞানের আলোক গড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প-কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান
তোমরা অপরে শিক্ষা দিয়াছ হইয়া মুসলমান।
তোমরা খুলিলে ডাক বিভাগ, জরিপ করিলে জমি
অপরে শিখালে সুশাসন নীতি, কেমনে ভুলিলে তুমি?
গোলামের বেশে তব দরবারে শত শত নবজাত
অবনত শির লোভিত কৃপা পাতিয়া যুগল হাত।
ত্যাগের মহিমা, ঈমানের আলো ছিল তোমাদের অন্তরে
অর্ধজাহানের বাদশাহী তাজ শোভিত তোমাদের শিরে।
ছাড়িয়াছ আজ নবীর তরীকা আল্লাহ্‌র ফরমান
লাঞ্ছিত তাই বিশ্বের কাছে হইতেছ হতমান।
ইসলামের নামে ভারতবক্ষ চিরিয়া লভিলে পাকিস্তান
সেই ইসলামী আদর্শে আজ করিতেছ অপমান।
নামে ও লেবাসে, কৃষ্টি-কালচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায়
ধরিয়াছ সবে বিজাতীয় চাল হৃদয় দহিয়া যায়।
যেরূপ এদের চলন-ধরন, শরীরে যে বেশ রাখে?
মনে হয় এরা বিলাতী সন্তান বিলাতেই বুঝি থাকে।
দু'শত বছর করেছ গোলামী! মনে নাই সেই লাজ?
স্বাধীন হয়েও গোলামের বেশে থাকিতে চেয়েছ আজ।
জানিও তুমি! ইসলাম রবি আছে, রবে চিরদিন
তুমিও একদিন অদৃশ্যের পথে সমূলে হইবে লীন।
জ্বালায় আল্লাহ যে প্রদীপ তবে, নিভাতে চাহিলে হায়
নিভে নাই কভু, নিভিবে না আর, শুধু তারাই নিভে যায়।
প্যালেস্টাইনের শোচনীয় দশা হের তুমি একবার
আর ঘুমায়ো না, নয়ন মেলিয়া দেখ দেখ এইবার।
বলিতেছি আমি, ওগো মুসলিম! স্মরণ রাখিও ভাই
আজও 'পাকভূমে' রহিবে যে ঘুমে তার জাগরণ নাই।
একশ' ত্রিশ কোটি 'মুসলিম জাতি' ছেড়ে দিয়ে সব দলাদলি
ইসলামের এই শীতল ছায়ায় আজ গলে গলে যাও মিলি।
মরিলে তোমরা হইবে 'শহীদ' বাঁচিলে হইবে 'গাযী'
তবে রক্ত দানের মর্ম ক্ষেত্রে, কেন ভয় করিবে আজি?
হায়দারী জোশে, ফারূকী সাহসে, খালিদের হুংকারে,
উড়াও সকলে বিজয় নিশান এই অবনীর পরে।
বাদশার জাতি বাদশাহ হইবে, হয়ে সবে গরীয়ান,
নিখিল বিশ্ব গাহিবে আবার তোমাদের জয়গান।
দুই হাতে ধরি কুরআন ও সুন্নাহ উন্নত করি শির,
বজ্রনিনাদে গেয়ে চল সবে নারায়ে তাকবীর।

[অত্র কবিতার লেখক মরহূম ডাঃ আব্দুল মজীদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র একজন একনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পিতা। গত ৬ এপ্রিল'০৯ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর স্বরচিত এই কবিতাটি একবার সাতক্ষীরা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় পাঠ করেন, যা পাঠকদের উদ্দেশ্যে পত্রস্থ করা হ'ল। -সম্পাদক]

***

সবার আগে আমি মুসলমান

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
৭৫, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমি বাঙালী, আমি বাংলাদেশী
সবার আগে আমি মুসলমান,
যতদিন দেহে এ প্রাণ রবে
নিঃশ্বাস রহিবে বহমান।
বাংলার জয়গান করব
দেশ গড়ায় অবিরাম লড়ব,
তাই বলে এই নয় শেষ কাম।
বেলা শেষে জীবনের ইতি
শেষ হবে সব সম্প্রীতি,
যেতে হবে জানি আখের-মোকাম।
যতদিন ভবে আছি আমি
দুনিয়ার পরিচয়ে দামী
বাঙালী, বাংলাদেশী যাই বল না,
নিঃশ্বাস সাঙ্গ হ'লে
জগৎ দিবে যে ফেলে
মুসলমান না হ'লে সেদিন পাব যাতনা।
বাংলাদেশ আল্লাহ্‌র দান
ভালবাসি এই ওয়াতান,
যতদিন দেহে রবে এই প্রাণ।
মরণের পরেই তো ভয়
ঐ দিনের নেই কোন লয়,
তাইতো করি সদা সত্যের সন্ধান।

***

বাঁচতে চাই

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

দল চাই না বল চই না
চাই যে কোদাল কাস্তে,
চাই শুধু মোর স্বাধীন দেশে
স্বাধীনভাবে বাঁচতে।
নেতা-নেত্রী হ'তে চাই না
চাই না দালান কোঠা যে
চাই না খুনের জখম হ'তে
রক্তের কোন ফোঁটা যে।
সূদ চাই না ঘুষ চাই না
চাই না পেতে ক্ষমতা,
মিলে-মিশে চাই যে শুধু
বাঁচতে দেশের জনতা।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক- এশিয়া মহাদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. চীন। ২. মালদ্বীপ।
৩. কাস্পিয়ান সাগর। আয়তন ৩,৯৪,২৯৯ বর্গ কি.মি.।
৪. বৈকাল হ্রদ। গভীরতা ১,৬২০ মিটার।
৫. ইয়াংসিকিয়াং। দৈর্ঘ্য ৫,৯৮০ কি.মি.।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণীবিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. ডার্ফ পিগমী গোবী।
২. দৈর্ঘ্য ৭.৫০ মি.মি. থেকে ৯.৯ মি.মি. এবং ওযন ৪ থেকে ৫ মিলিগ্রাম।
৩. কেবল ফিলিপাইনে পাওয়া যায়।
৪. এটি এক ধরনের কাঁকড়া।
৫. বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার নোনাপানিতে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. পৃথিবীতে মোট কতজন নবী ও রাসূল প্রেরিত হয়েছেন?
২. মোট প্রেরিত রাসূলের সংখ্যা কত?
৩. প্রথম মানুষ ও নবী কে ছিলেন?
৪. পবিত্র কুরআনে মোট কতজন নবীর নাম এসেছে?
৫. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার মধ্যে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণীবিজ্ঞান)

১. তেলাপোকার রক্ত দেখতে কেমন?
২. সবচেয়ে বড় সরীসৃপ প্রাণী কোনটি?
৩. কোন প্রাণী প্লেগ রোগের কারণ?
৪. বিড়াল থেকে কোন রোগের সৃষ্টি হয়?
৫. স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ সংখ্যা কত?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

আতানারায়ণপুর, রাজশাহী ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ১০-টায় মোহনপুর থানাধীন আতানারায়ণপুর ইসলামিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা আইয়ূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী যেলার উপদেষ্টা আফাযুদ্দীন এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ওসমান গণী ও জাগরণী পরিবেশন করে শরীফুল ইসলাম।

মেন্দীপুর, বগুড়া ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দীপুর সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বগুড়া যেলার পরিচালক আসাদুয্যামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, সোনামণি বগুড়া যেলার সহ-পরিচালক আবুল খায়ের, অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল করীম, হাফেয আদম আলী প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমর ফারূক ও জাগরণী পরিবেশন করে আমীনুল ইসলাম।

বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া ৩ এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য দুপুর পৌনে চারটায় বৃ-কুষ্টিয়ার দারুল হাদীছ সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি বগুড়া যেলার সহ-পরিচালক নজীবুল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান, অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আমীনুল ইসলাম, শাহাদাত হুসাইন, শামসুল ইসলাম, মুস্তাফীযুর রহমান, নযরুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আলমগীর হুসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

বালিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার: অদ্য বাদ ফজর যেলার পবা থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মক্তবের শিক্ষক হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ যাকারিয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তারিক ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি নিলুফা খাতুন।

মণিগ্রাম, রাজশাহী ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার: অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'সোনামণি' হাবাসপুর শাখার সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাজমা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

হাবাসপুর, রাজশাহী ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার: অদ্য বাদ আছর বাঘা থানাধীন হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ খুরশিদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র শাখার সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুরাইয়া খাতুন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সেনাবাহিনীতে কওমী মাদরাসা ছাত্র থাকার প্রমাণ মেলেনি

-বিশ্বব্যাংক

'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কওমী মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ঢোকার কোন প্রমাণ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা কার্ল জে. সিওভাচ্চো এবং সাবেক কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমানের সেনাবাহিনীর শতকরা ৩৫ ভাগ সদস্য মাদরাসা থেকে আসার দাবী সঠিক নয়'। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক এ তথ্য উপস্থাপন করেছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বর্তমানে মাদরাসাগুলোর শতকরা ৫৭ ভাগ খরচ জোগাড় হয় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ কোন ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় না। ১১ ভাগ আয় হয় ছাত্র বেতন থেকে। তবে সব মাদরাসায় বিনামূল্যে পড়ানো হয় না। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন ভূইয়ার কাছে গত ১৫ মার্চ বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়ান ঝু এ রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী সজীব ওয়াজেদ জয় এবং ইরাক ও সঊদী আরবে দায়িত্ব পালনকারী মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা কার্ল জে. সিওভাচ্চো গত নির্বাচনের ঠিক আগে হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউতে 'বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের উত্থান-পতন' শীর্ষক এক নিবন্ধ লিখেন। যৌথভাবে লেখা উক্ত নিবন্ধে বাংলাদেশে মৌলবাদের বিস্তারে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ইসলামী জঙ্গীবাদ বিস্তার লাভ করছে সামরিক বাহিনীতে ইসলামপন্থীদের সংখ্যা বাড়ার কারণে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সেনাবাহিনীতে ঢোকার ভর্তি পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে মাদরাসায়। সেনাবাহিনীতে ঢোকার ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে মাদরাসায় প্রশিক্ষণের মিল আছে। সেনাবাহিনীতে ঢোকার জন্য মাদরাসায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার আগে ২০০১ সাল পর্যন্ত শতকরা মাত্র ৫ ভাগ মাদরাসার ছাত্র সেনাবাহিনীতে ভর্তি হ'তে পারত। ২০০৬ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগে'।

জয়ের লেখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত ১৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ শাখা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের (বিলিয়া) কর্ণধার সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান 'জঙ্গীবাদ দমনে সুশীল সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বলেছেন, তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় সেনাবাহিনী, বিডিআর ও আইন-শৃংখলা বাহিনীতে মাদরাসা পাস করা শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে ৭ গুণ বেশী ঢুকে পড়েছে। অতীতে মাত্র ৫ ভাগ মাদরাসা পাস লোক যেখানে এসব বাহিনীতে আসত, জোট সরকারের আমলে তা ৭ গুণ বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশেরও বেশী হ'তে পারে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে বেশীরভাগই এসেছে কওমী মাদরাসা থেকে, যাদের বেশীর ভাগই জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আরো উল্লেখ্য, প্রতি বছর প্রাথমিক স্কুলে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, কওমী মাদরাসায় এই সংখ্যা শতকরা মাত্র ১ দশমিক ৯ ভাগ। এনজিও পরিচালিত স্কুলে এই ভর্তির হার ৮ দশমিক ২ ভাগ। কওমী মাদরাসায় এ শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে ২০০৮ সালে ডিসেম্বরে প্রথম জরিপ করে বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্টাটিসটিক্স। জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২৩০টি মাদরাসা এবং ১৪ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা

গত ২রা মে টঙ্গীর পাগড়ার আলেরটেক এলাকায় অভাবের তাড়নায় হামিদ আলী (৩২) নামের এক রিক্সাচালক আত্মহত্যা করেছে। নিহতের স্ত্রী মমতা বেগম জানান, কিছুদিন আগে ফকীর মার্কেটের ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী ফযলের কাছে মাল দেয়ার কথা বলে হামিদ ৭ হাযার টাকা দাদন আনে। পরে বিভিন্ন সময় তাকে ভাঙ্গারি মালামাল দিয়ে ৩ হাযার টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু ৪ হাযার টাকা বকেয়া রয়ে যায়। এক পর্যায়ে ভাঙ্গারি মাল কুড়িয়ে মহাজনের টাকা শোধ করে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে সে আগের পেশা ছেড়ে দিয়ে রিক্সা চালানো শুরু করে। এতে তার ভাঙ্গারি ব্যবসার মহাজন ক্ষিপ্ত হয়ে বকেয়া টাকার জন্য বারবার চাপ দিতে থাকে এবং ১ মে টাকা পরিশোধের জন্য গালমন্দ করে। এ অপমানের গ্লানি সইতে না পেরে সে পরের দিন ভোররাতে সবার অলক্ষ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তার নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে। নিহতের গ্রামের বাড়ী টাঙ্গাইল যেলার মধুপুর থানার বোকারবাড়ী।

সূদের ঋণ থেকে মুক্তি পেতে কিডনী বিক্রি!

বাবা কিডনী নেবেন। আমি একজন ঋণগ্রস্ত মা। মরার আগেই ঋণ শোধ করতে চাই। এমন কেউ কি আছেন, যিনি আমার একটা কিডনী কিনে নিবেন। প্রতিদিন এ বাড়ী ও বাড়ী ফেরি করার মতো কিডনী বিক্রি করার কথা বলে চলেছেন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া মাগুড়াডাঙ্গা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ গোলাম আকন্দের স্ত্রী মাজেদা খাতুন জোছনা (৫৫)। ঋণের ভারে জর্জরিত মাজেদা খাতুন জানান, সংসার চালাতে গিয়ে তিনি 'আরআরআরএফ' এনজিও থেকে ১২ হাযার, ব্যুরো টাঙ্গাইল থেকে ১০ হাযার, ব্র্যাক থেকে ১৫ হাযার, আশা এনজিও থেকে ৮ হাযার টাকা, আফসান বেওয়া ও মালেকা খাতুনের কাছ থেকে ৩০ হাযার টাকা, সর্বমোট ৭৫ হাযার টাকা উচ্চ সূদে ঋণ নিয়েছেন। বৃদ্ধ স্বামী অসুস্থ থাকায় সংসার চালাতে গিয়ে তাকে ঋণ নিতে হয়েছে। এনজিওগুলো ও দাদন ব্যবসায়ীরা ঋণের টাকা ও কিস্তি পেতে ব্যাপক চাপ দেয়ায় মাজেদা খাতুন দিশেহারা হয়ে কিডনী বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। মাজেদা খাতুন জানান, কিডনী বিক্রি করে তিনি ঋণ পরিশোধ করবেন। মরার আগে আর তাকে ঋণের জ্বালা সইতে হবে না।

পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

অবশেষে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। গত ১৩ মে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর শেষে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাশিয়া যাবে। সেখানে আলোচনা শেষে এ কেন্দ্র স্থাপনে কত অর্থের প্রয়োজন

হবে তা ঠিক করা হবে। কাজ শুরুর পর ৪/৫ বছর লাগবে এ কেন্দ্র স্থাপনে। আপাতত সরকার ৬শ' থেকে ১ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে। দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ ভাগের বেশী পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে আমেরিকা ও চীনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। রাশিয়া, আমেরিকা ও চীনের মধ্যে যে কোন এক দেশের কাছ থেকে এ প্রযুক্তি নেয়া হবে। বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মোশাররফ হোসাইন ও রাশিয়ার পক্ষে রাশিয়ান স্টেট এনার্জি কর্পোরেশনের মহাপরিচালক এনএন এস্ত্রাসকি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশে প্রতি বছর ৪ হাযার কোটি টাকার সম্পদহানি হয়, মারা যায় ১২ হাযার মানুষ

প্রতি বছর দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাযার কোটি টাকার সম্পদহানি এবং ১০ থেকে ১২ হাযার মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। গত ১৬ মে খুলনা যেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে চালকদের সচেনতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সেমিনারে সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে ১০টি কারণকে চিহ্নিত করা হয়। সেমিনারে উত্থাপিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির বছরে ক্ষতি হয় ৪ হাযার কোটি টাকা। যা জিডিপির শতকরা ২ ভাগ। সেমিনারে আরও বলা হয়, ৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সীরাই দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে। এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হওয়ার পর তাদের পরিবারে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে এবং সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে তাদের অবদান থাকে না। শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ দুর্ঘটনা মহাসড়কে এবং ৯০ ভাগ দুর্ঘটনা শহরাঞ্চলে ঘটে থাকে বলেও উল্লেখ করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে ১০টি কারণ চিহ্নিত করে বলা হয়, বেপরোয়া ও অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন চালনা, মাত্রাতিরিক্ত গতি ও ওভারলোডিং, যান্ত্রিক ক্রটি, বিপজ্জনক সড়ক, পথচারীদের অসতর্কতা, চালকদের অনভিজ্ঞতা, ট্রাফিক আইনের যথাযথ অনুসরণ না করা, আইন বাস্তবায়নের অভাব এবং সড়কগুলোতে মিশ্র যানবাহন চালনা দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ কারণ।

পানি দিয়ে চলবে গাড়ী

পানি দিয়ে চলবে গাড়ী। শুনতে বিস্ময়কর মনে হ'লেও অভিনব এই প্রযুক্তিটি আবিষ্কার করেছেন চট্টগ্রামের রাউজানের বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন জসীম। এতে প্রতিবছর প্রায় অর্ধেক জ্বালানী খরচও সাশ্রয় হবে বাংলাদেশের। এক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা পেলে আগামী ৩ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদী তিনি। জসীম জানান, তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মূল সূত্র হ'ল ব্যাটারি সংযোগের মাধ্যমে ইলেকট্রোলাইজড হয়ে পানি থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস বের হয়ে ইঞ্জিনে ইন্টেক্ট ম্যানিফোল্ড প্রবেশ করে জ্বালানী তেলের সহায়ক হিসাবে কাজ করা। কিট ব্যবহারকারী ইঞ্জিন চালু করা মাত্রই হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে এবং স্টার্ট বন্ধ করা মাত্রই তা বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি জানান, এখন ফুয়েল এবং গ্যাস এ কিটের জ্বালানী হ'লেও ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং হাইড্রোজেন গ্যাস এ কিটের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ফলে ভবিষ্যতে এ কিট আরো জ্বালানী সাশ্রয়ী হয়ে উঠবে। এতে করে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বেই ৫০-৭৫ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

উদ্ভাবক জসীম আরো জানান, পরিবেশবান্ধব এ প্রযুক্তিটি গাড়ীতে স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না এবং গ্যাস স্টোরেজ না হবার ফলে শতভাগ নিরাপদও বটে। কিট স্থাপনে গাড়ীর ইঞ্জিনে হাত দিতে হবে না। বুয়েটের পরীক্ষণেও সফলতা এবং বিআরটিএ'র অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে দাবী করেছেন উদ্যোক্তা এবং হাইড্রোফুয়েল কিটের বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান নোবেল ভেনচারের এমডি মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে কোন বাড়তি যন্ত্রাংশের সংযোজন ছাড়া ভিভিটিআই, কার্বুরেটর এবং ডিজেল ইঞ্জিনচালিত যে কোন যানবাহনে এ কিট ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া ফোর স্টোক মোটরসাইকেলের উপযোগী করেও একটি কিট তৈরী করা হয়েছে। ১৮০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ীর জন্য একটি কিট এবং এর বেশী সিসি হ'লে ২টি কিট ব্যবহার করতে হবে।

গাড়ীর কিটের জন্য খাবার উপযোগী ৩ লিটার পানির সাথে ৩ মি.লি. বিশেষ কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে এবং মোটর সাইকেলের জন্য ১ লিটার পানির সাথে ২ মি.লি. কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে। পানির পরিবর্তন করতে হবে ১ দিন পরপর।

বাকৃবি বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর আবিষ্কার

রোবটিক লোহিত রক্তকণিকা ধরবে ভাইরাস

এবার রোবটিক লোহিত রক্তকণিকা হিমাগ্লুটিনেটিং ভাইরাস ধরবে এবং ঘনীভূত করবে। এ রোবটিক লোহিত রক্তকণিকা দিয়ে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লুসহ (ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস) যে কোন ধরনের হিমাগ্লুটিনেটিং ভাইরাস শনাক্তকরণে খরচ হবে মাত্র ৩৫ পয়সা। বিস্ময়করভাবে ভাইরাস ধরতে সক্ষম রোবটিক লোহিত রক্তকণিকা বিশ্বে প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আলিমুল ইসলাম।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আলিমুল ইসলাম রোবটিক লোহিত রক্তকণিকার আবিষ্কার ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বলেন, প্রতিনিয়ত হাযার হাযার ভাইরাস পুরনো ও নতুন ধরনের বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে। যার মধ্যে আছে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু, সার্স করনা, স্প্যানিশ ফ্লু ইত্যাদির মতো ভয়াবহ ক্ষতিকর ভাইরাস। তিনি বলেন, সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূকরের মধ্যে লক্ষণবিহীন অবস্থায় বিরাজ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি ও গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে। মানুষ সোয়াইন ফ্লু বা সিজনাল ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে সচরাচর যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তাহ'ল উচ্চ তাপমাত্রা, গলাব্যথা, মাথাব্যথা, শরীর ও অস্থিসন্ধি ব্যথা, বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া। সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিমান, নৌ ও স্থলপথে কোয়ারেন্টাইন সেল তৈরী করা হয়েছে। ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ লক্ষণগুলো দেখা দিলে সচরাচর যেসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাহ'ল লালা, থ্রট ওয়াশ, থ্রট সোয়াব এবং মূত্র, যেখানে ভাইরাসের পরিমাণ অনেক সময় এতো কম পরিমাণ থাকে যে, ঐ পরিমাণ ভাইরাস দিয়ে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ডঃ ইসলাম বলেন, পানিতে উপস্থিত ভাইরাসগুলো (অর্থোমিক্সো বা প্যারামিক্সো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত) ধরার জন্য স্বাভাবিক লোহিত

রক্তকণিকার কোন ক্ষমতা নেই; কারণ পানিতে স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকা সহজেই ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই রোবটিক লোহিত রক্তকণিকার বিকল্প নেই। তিনি জানান, সরকার চাইলে দেশের কল্যাণে বিভিন্ন জটিল ভাইরাস শনাক্তকরণের সুবিধার্থে বিনামূল্যে এ প্রযুক্তি দিতে প্রস্তুত আছেন তিনি।

প্রতি বছর তামাকের কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করে ৪ লাখ মানুষ

তামাকের কারণে দেশে প্রতি বছর প্রায় ৪ লাখ মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করছে। আর ধূমপানের কারণে মারা যায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। তামাকের কারণে প্রতি বছর ৬ হাযার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। যা বাংলাদেশের মোট উন্নয়ন বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ। 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। এদিকে অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি বছর তামাক জাতীয় পণ্য থেকে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন হয় এর চেয়ে ব্যয় হয় বেশী। বছরে ১১ হাযার কোটি টাকার তামাক পণ্য থেকে রাজস্ব আয় হয় ৫ হাযার কোটি টাকা। আর তামাকের কারণে মানুষের মৃত্যু, নানা রকম রোগবালাইসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর বিষয়ে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয় ৬ হাযার কোটি টাকা।

পাবনায় ময়দা চালের গুঁড়া মিশিয়ে তৈরি হয় এন্টিবায়োটিক, আটা দিয়ে বেদনানাশক ট্যাবলেট, পানি দিয়ে ইঞ্জেকশন

ময়দা ও চালের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি করা হ'ত জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক। আটা দিয়ে তৈরি হ'ত বেদনানাশক ট্যাবলেট আর পানি দিয়ে তৈরি হ'ত দামি ইঞ্জেকশন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন বাঁচাতে মানুষ কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে কিনছে নামি-দামি বড় কোম্পানির ওষুধ। কিন্তু দামি ওষুধে রোগ নিরাময় হচ্ছে না। পরে দেখা যাচ্ছে ওষুধটি ছিল নকল। গত ৬ মাসের ব্যবধানে পুলিশ পাবনায় এরকম ৪টি নকল ওষুধ কারখানার সন্ধান পেয়েছে। এসব নকল কারখানা থেকে উদ্ধার করেছে প্রায় তিন কোটি টাকার বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানির নকল ওষুধ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ডিয়াঞ্জিট, ল্যাক্সটোনিল, ভারমিকম, জিওলিন, সিপ্রোসিনসহ নানা ধরনের ওষুধ নকল করা হয়। উত্তরের যেলাগুলোতে এসব নকল ওষুধের পাশাপাশি ভারতীয় নিম্নমানের ও ভেজাল ওষুধও বিক্রি চলছে দেদারসে। বিদেশী ও দামি ওষুধগুলোই নকল হয় বেশী। ভারতীয় ওষুধ বিক্রি অনেকটা ওপেন সিক্রেট।

গত মার্চ মাসে পাবনার কুঠিপাড়ায় একটি নকল ওষুধ তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে ৫০ লাখ টাকা মূল্যের নকল এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে পুলিশ ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালসের লেবেলে তৈরীকৃত কয়েক লাখ ইন্দোমক্সিন ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল, ক্যাপসুল তৈরির জন্য রাখা বিপুল পরিমাণ চালের গুঁড়ো, ময়দা, লেবেল, নকল ইঞ্জেকশন তৈরির জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে। এছাড়াও গত ২৫ সেপ্টেম্বর পাবনা শহরের জুবিলি ট্যাংকপাড়া থেকে একই ধরনের ৭০ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন কোম্পানির নকল ওষুধ এবং ওষুধ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে পুলিশ। উল্লেখ্য, এই চক্রটি ২০০২ সালে পাবনা মানসিক হাসপাতালে নকল ইঞ্জেকশন সরবরাহ করে। পরে সেখান থেকে ১০ হাযার নকল ইঞ্জেকশন আটক করা হয়। কিন্তু সে সময় দুর্বল তদন্তে মূল আসামিরা বেঁচে যায়। তারপর থেকে শুরু হয় পাবনায় নকল ওষুধের জমজমাট ব্যবসা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পাবনার ছোট-বড় প্রায় ২০ ওয়ার্কশপ এই ওষুধ তৈরির মেশিন তৈরি করছে। যার ফলে পাবনায় নকল ওষুধের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। পাবনা সদর থানার ওসি ইকবাল শফি জানান, পুলিশ নকল ওষুধ তৈরির মূল হোতাদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে।

ঢাকার পানির স্তর প্রতি বছর দুই থেকে তিন মিটার নিচে নামছে

রাজধানী ঢাকার পানির স্তর প্রতি বছর দুই থেকে তিন মিটার করে নিচে নেমে যাচ্ছে। গত দুই বছর ধরে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার এ হার আগের বছরগুলোর তুলনায় দ্রুত বাড়ছে। পানির স্তর সবচেয়ে বেশী নেমে গেছে মতিঝিল, খিলগাঁও, বাসাবো, মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও তেজগাঁও এলাকায়। এসব এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর এক হাযার ফুট বা তার চেয়ে বেশী নিচে নেমে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে পরিচালিত এক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতা যেখানে ছিল গড়ে ২৬ দশমিক ৬ মিটার, সেখানে গত বছর জানুয়ারীতে এই পানির স্তর মাটির নিচে ৬০ মিটারে নেমে গেছে। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর পানির সঙ্কট যেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, তেমনি এই শহর দেবে যাওয়া ও ভূমিধসসহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজধানী ঢাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার মূল কারণ হিসাবে ওয়াসার বিশেষজ্ঞরা ভূ-গর্ভস্থ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনকেই দায়ী করেছেন। বর্তমানে ওয়াসার সরবরাহকৃত পানির মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগই ভূ-গর্ভস্থ পানি। বাকি শতকরা ১৪ ভাগ পানি ভূ-উপরিস্থ থেকে উৎপাদিত হয়। বিশেষজ্ঞরা গভীর নলকূপ দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার অর্থাৎ নদীর পানি পরিশোধন করে তা ব্যবহারের প্রকল্প নেয়ার পরামর্শ দেন।

ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে লণ্ডভণ্ড দেশের দক্ষিণাঞ্চল

প্রলয়ঙ্করী সিডরের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ঘূর্ণিঝড় আইলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। গত ২৫ মে দুপুরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আঘাত হানে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আইলা। এর সঙ্গে আসা ১০ থেকে ১২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর সহ বিভিন্ন যেলায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে দুই শতাধিক। নিখোঁজ রয়েছে অনেকে। প্রতিনিয়ত লাশের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রবল ঘূর্ণিঝড় আইলার সর্বগ্রাসী উন্মত্ততায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে উপকূলীয় এলাকার অসংখ্য ঘরবাড়ী, গাছ-পালা ও রাস্তাঘাট। বান ও বাতাসের হিংস্র তাণ্ডবে বহু ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হওয়ায় গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে উপদ্রুত এলাকার লোকজন। লবণাক্ত পানির কারণে উপকূলীয় যেলাগুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আক্রান্ত এলাকা গুলোতে বুভুক্ষ মানুষের আর্তনাদ ক্রমেই দেশের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ না পৌছানোর কারণে উপদ্রুত এলাকাগুলোতে চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বাস্তুহারা মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ।

বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ না খেয়ে ঘুমায়

খাদ্য সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না পৃথিবীর অনুন্নত আর উন্নয়নশীল দেশগুলো। কারণ গত বছর বিশ্বে যে পরিমাণ ক্ষুধার্ত মানুষ ছিল, এ বছর তার সংখ্যা আরো বেড়েছে। জাতিসংঘের এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারাবিশ্বে প্রতি রাতে ১০০ কোটি লোক না খেয়ে ঘুমাতে বাধ্য হচ্ছে। আর প্রতি ছয় সেকেণ্ডে একটি করে শিশু মারা যায় অপুষ্টির কারণে। ২০০৮ সালে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে দেখা গেছে, খাদ্য সংকটে ৮৮টি অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে সর্বনিম্নে অবস্থান করছিল কঙ্গো। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ৬৬তম ও বাংলাদেশের অবস্থান ৭০তম।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসের শিকার ভারত

সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়া দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। দেশটিতে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে হামলা ছাড়াও ২০০৮ সালে বড় ধরনের সাতটি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে ভারত। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল জয়পুরে বোমা হামলা, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা এবং আহমেদাবাদ, দিল্লী ও আসামে হামলা।

মার্কিন নজরদারি তালিকার ৩৫ শতাংশই ভুল এবং অসম্পূর্ণ

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি এবং নিজের দেশের দুর্নীতি কিংবা অন্য কোন ইস্যু নিয়ে মার্কিন সংস্থাগুলো যেসব তালিকা প্রণয়ন করে থাকে, তার প্রায় ৩৫ শতাংশই ভুল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেদেশের বিচার বিভাগীয় এক রিপোর্টে। সংখ্যায় এর পরিমাণ প্রায় ১১ লাখ। বিচার বিভাগীয় রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, এফবিআই যেসব সন্দেহভাজন ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছে, তার মধ্যে বিপুলসংখ্যক রিপোর্ট বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে একই অবস্থায়। এর কোন সংস্কার, সংশোধনী কিংবা কালানুক্রমিক দেখানো হয়নি। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (আকলু)-এর লেজিসলেটিভ ডিরেক্টর ক্যারোলিন ফ্রেড্রিকশন বলেছেন, ওয়াচলিস্টের এই দুরবস্থার কারণে এখন দেখা যাচ্ছে হাযার হাযার লোককে সম্পূর্ণ ভুল বিচার করা হচ্ছে, লাখ লাখ নির্দোষ ঘটনাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সন্ত্রাস কিংবা দুর্নীতি হিসাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুখমণ্ডল প্রতিস্থাপনে সাফল্য

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে নির্যাতিত নারী কলি কালপের (৪৬) পুরো মুখমণ্ডল সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে কলির এ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হ'লেও তখন তাঁর পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য গোপন রাখা হয়। গত ৫মে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাভাবিক চেহারায় কলিকে হাযির করে চিকিৎসকেরা দাবী করেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ ধরনের অস্ত্রোপাচারের ঘটনা এটিই প্রথম। পাঁচ বছর আগে স্বামীর আগ্নেয়াস্ত্রের গুলীতে মুখমণ্ডল ঝাঁজরা হয়ে যায় কলি কালপের। প্রাণে রক্ষা পেলেও বিকৃত মুখমণ্ডল নিয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে থাকেন কলি। তাঁর নাক-মুখের অস্তিত্বই ছিল না। ডিসেম্বরে দীর্ঘ ২২ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিস্থাপন করা হয়। কলির নাক, ঠোঁট, চোয়াল প্রতিস্থাপন করে মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক আদল ফিরিয়ে আনা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গকারী কার্টুনিষ্ট আগুনে পুড়ে মারা গেছে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গকারী ডেনিশ কার্টুনিষ্ট আগুনে পুড়ে মারা গেছে। ইনডিয়ান মুসলিমসহ কয়েকটি ওয়েবসাইটে এ খবর দেয়া হয়েছে। খবরে বলা হয়, ডেনমার্কের 'জিলান্ডস পোস্টেন' পত্রিকায় যে কার্টুনিস্ট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছেপেছিল সে তার শোবার ঘরে আগুনে পুড়ে মারা যায়। নিন্দিত এবং ধিকৃত এ কার্টুনিস্টের অপমৃত্যুর খবরে সারাবিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মন্তব্য, ডেনিশ কার্টুনিস্ট যে জঘন্য অপরাধ করেছিল এ অপমৃত্যু তার জন্য প্রাপ্য ছিল। আল্লাহ এই দুনিয়াতেই ঘৃণ্য পাপীর শাস্তি দিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ডেনিশ পত্রিকায় ঐ কার্টুন ছাপা হয়।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করবে গাড়ির গতি!

মানুষের হাতে গাড়ি চালানোর দিন প্রায় শেষ। সামনের দিনে কম্পিউটারই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে গাড়ির গতিপথ, যাত্রীরা নিরাপদে পৌঁছে যাবেন আপন গন্তব্যে। কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া গতিসীমা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই। ফাঁকা রাস্তায় ইচ্ছামতো গতিতে ছুটবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। আবার ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় গতি নেমে আসবে আপনাআপনি। লন্ডনের রাস্তায় আসন্ন গ্রীষ্মে প্রথমবারের মতো নামাবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়িবহর। শহরের মেয়র বরিস জনসন জানান, প্রথম দফায় পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি কার, একটি বাস ও একটি কালো ক্যাবে স্থাপন করা হবে কম্পিউটার। এরপর ছয় মাস ধরে চলবে পর্যবেক্ষণ। ভাল ফল মিললে লন্ডনের রাস্তায় আরও বেশী কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি সংযোজন করা হবে।

নতুন পদ্ধতিতে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সড়কে গাড়ির গতি ঠিক করবে কম্পিউটার। প্রয়োজনে গতি বাড়ানো-কমানোর দায়িত্বও থাকবে কম্পিউটারের হাতে। লন্ডনের যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, নতুন প্রযুক্তির গাড়ি সড়ক দুর্ঘটনার হার অন্তত ১০ ভাগ কমিয়ে আনবে। এ প্রযুক্তি সংযোজনের জন্য গাড়ির দাম ৫০০ পাউন্ড বেশী হবে।

নতুন প্রযুক্তির গাড়িতে যাত্রীরা চাইলে কম্পিউটারকে পরামর্শ দিতে পারবেন। এ জন্য 'ভলান্টারি' ও 'অ্যাডভাইজারি' অপশনে একটি স্ক্রিনে গাড়ির গতি দেখতে পাবেন যাত্রীরা। লাগামহীন গতিতে ছোটার সময় ভয়ে আঁতকে উঠলে একটি হাস্যোজ্বল মুখ কটাক্ষ করবে যাত্রীকে। আর ভলান্টারি অপশনে গাড়ি চালালে কখনোই তা সর্বোচ্চ গতিসীমা অতিক্রম করবে না।

Contents

ভারতে কংগ্রেসের বিপুল জয় ॥ দ্বিতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনমোহনের শপথ গ্রহণ

ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে অভাবনীয় বিজয় লাভ করেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন ইউপিএ জোট সরকার। ৫৪৩টি লোকসভা আসনের নির্বাচনে কংগ্রেস জোট ২৬৩টি আসনে বিজয়ী হয়। কংগ্রেস এককভাবে পেয়েছে ২০৬টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ১১৬টি আসন, তৃতীয় ফ্রন্ট ৭৯ ও অন্যান্য দল পেয়েছে ৪৬টি আসন।

এদিকে নির্বাচনে জয়লাভের পর দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন মনমোহন সিং। তাঁর সঙ্গে শপথ নিয়েছেন আরো ১৯ জন পূর্ণ মন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল গত ২২ মে নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। উল্লেখ্য যে, জওহরলাল নেহেরুর পর মনমোহনই পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হ'লেন। ২০০৪ সালের ২২ মে তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন প্রণব মুখোপাধ্যায় (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), শারদ পাওয়ার (কৃষিমন্ত্রী), একে এন্থনি (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী), পি চিদাম্বরম (অর্থমন্ত্রী), মমতা ব্যানার্জি, গোলাম নবী আযাদ, বীরাপ্পা মৈত্রী, সুশীল কুমার শিন্ধে, এসএম কৃষ্ণা (পররাষ্ট্র মন্ত্রী), ভায়লার রবি, জয়পাল রেড্ডি, কপিল সিব্বাল, আনন্দ শর্মা, অম্বিকা সোনি, মুরলি দেওরা, কমল নাথ, বি কে হান্ডিক, সি পি যোশি ও মিরা কুমার।

তামিল নেতা প্রভাকরণ নিহত, শ্রীলংকায় গৃহযুদ্ধের অবসান

শ্রীলংকায় ২৬ বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেছে। গত ১৮ মে তামিল গেরিলা সংগঠন 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমে'র (এলটিটিই) নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ (৫৪) নিহত হওয়ার পর সরকার এই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে তাদের বিজয় ঘোষণা করেছেন। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত খবরে বলা হয়, প্রভাকরণসহ কয়েকজন তামিল নেতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধকবলিত এলাকা থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে পালিয়ে যাওয়ার সময় সেনারা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে। এতে প্রভাকরণ গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি ছাড়াও এলটিটিইর গোয়েন্দা শাখার প্রধান পোতু আম্মান, সি টাইগার্সের প্রধান সুসাই, প্রভাকরণের ছেলে চার্লস অ্যান্টনি (২৪), গেরিলাদের রাজনৈতিক শাখার প্রধান বালাসিঙ্গম নাদেসান, গেরিলাদের সাবেক শান্তিবিষয়ক দফতরের প্রধান শিভারত্নম পুলিদেভান ও পূর্বাঞ্চলীয় নেতা এস রমেশও নিহত হয়। উল্লেখ্য, শ্রীলংকার ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানে তামিলদের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের জুলাই থেকে শুরু হওয়া শেষ ধাপের যুদ্ধে ৬ হাযার ২শ'রও বেশী সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় ৩০ হাযার। আড়াই যুগ ধরে চলা তামিলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭০ হাযার লোক মারা গেছে।

মাধব কুমার নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী

নেপালের বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা মাধব কুমার নেপাল (৫৬) দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। দেশটির পার্লামেন্ট গত ২৩ মে তাঁকে নির্বাচিত করে। এর মধ্য দিয়ে নেপালে চলা রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটল। নেপালের ২৪টি দলের মধ্যে ২২টির সমর্থন নিয়ে মাধব প্রধানমন্ত্রী পদে একমাত্র প্রার্থী ছিলেন। তিনি সিপিএন-ইউএমএন দলের নেতা। এর আগে তিনি দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

উল্লেখ্য, সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করার ঘটনায় দেশটির প্রেসিডেন্ট রাম বরণ যাদরের হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর থেকে নেপালে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে খৃষ্টানদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

মধ্যপ্রাচ্য মুসলিম এলাকা হ'লেও সেখানে এক সময় খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা ছিল অপরিহার্য শক্তি। লেবাননের প্রশাসনে খৃষ্টানদের ছিল অসামান্য প্রভাব। এখন সেখানে খৃষ্টান নাগরিকের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশে এসে ঠেকেছে। কিছুদিন আগেও ফিলিস্তীনের শীর্ষস্থানীয় পদগুলোও ছিল তাদের দখলে। মিসরে সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ধন-সম্পদ বেশী ছিল খৃষ্টানদের। ইরাকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় পদ ও সম্মানজনক অন্যান্য পেশায় খৃষ্টানদের অবস্থান ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সংখ্যা কমছে। বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা। ব্যতিক্রম শুধু ইসরাঈলে। সেখানে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদীর বাস। বাকী দেশগুলোয় মুসলমানদের একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে।

আজকের তুরস্কে ১০০ বছর আগেও লাখ লাখ খৃষ্টান ছিল। এখন তাদের সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। সে দেশের পার্লামেন্ট ও সেনাবাহিনীতে কোন খৃষ্টান সদস্য নেই। ফিলিস্তীন এলাকার মধ্যে পশ্চিম তীরে খৃষ্টানদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। সে তুলনায় জেরুযালেমে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক কমেছে। ১৯৪৮ সালে সেখানে খৃষ্টান বাসিন্দা ছিল এক-পঞ্চমাংশ। আর এখন তা দুই শতাংশে কমে এসেছে। ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান বলে পরিচিত বেহলেহেমে কয়েক শতাব্দী আগে খৃষ্টান নাগরিক ছিল ৮০ শতাংশ। বর্তমানে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন অভিযান চলাকালে সেখানে ১৪ লাখ খৃষ্টান ছিল। গত ছয় বছরে এর অর্ধেকই পালিয়ে গেছে। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই খৃষ্টানদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমছে।

ইরাক ও আফগান যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য মার্কিন সিনেটে ৯১.৩ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন

ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ২১ মে ২০০৯ সালের বাজেটে অতিরিক্ত ৯১.৩ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে আমেরিকার সিনেট। সিনেটররা কণ্ঠভোটে এ অর্থের অনুমোদন দেয়। এর পক্ষে পড়ে ৮৩ ভোট এবং বিপক্ষে পড়েছে ৩ ভোট। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদ দু'টি দেশে যুদ্ধ এবং পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য ৯৬.৭ বিলিয়ন ডলারের একটি বিল ১৪ মে অনুমোদন করেছিল।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানের মালাকান্দে ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মালাকান্দা যেলায় ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় সরকার। গত ২রা মে প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী একথা জানান। সীমান্ত প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী মিয়া ইফতিখার হুসাইন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, যেলাটিতে 'দারুল কাযা' বা ইসলামিক আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর আগে ফেব্রুয়ারীতে সহিংসতা কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদেশটির সোয়াত যেলায় ইসলামিক শরী'আহ আইন চালুর জন্য তালেবানদের সঙ্গে চুক্তি করে প্রাদেশিক সরকার। তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাদের প্রধান দাবী ছিল 'দারুল কাযা' প্রতিষ্ঠা এবং তা পূরণ করা হয়েছে। এখন অস্ত্র ধারণের আর কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না'।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় বড় বাধা ইসরাঈল

-বাশার আল-আসাদ

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ায় ইসরাঈলকে বড় বাধা হিসাবে উল্লেখ করেছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। এ সময় তিনি দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। দামেশকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে আসাদ বলেন, ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে।

আফগানিস্তানে ধর্মান্তকরণের জন্য অনূদিত বাইবেলগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে

আফগানিস্তানের যুদ্ধধ্বিস্ত অসহায় মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য আমেরিকান খৃষ্টান সেনাচক্রের অপচেষ্টা অবশেষে রহিত হয়েছে। আফগানদের মধ্যে বিতরণের জন্য স্থানীয় ভাষায় তারা যে বাইবেলগুলো অনুবাদ করেছিল তা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ও বিতর্কের মুখে আমেরিকান সেনা কর্তৃপক্ষ ২০ মে বাইবেলগুলো পুড়িয়ে ফেলার কথা জানান। আফগানিস্তানের আমেরিকান কর্নেল গ্রেগ জুলিয়ান জানান, বাইবেলগুলো যাতে আফগানিস্তানের স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিতরণ না করা হয়, সেকারণ এসব বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি আল-জাযীরাকে জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষের শঙ্কা দূর করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বাইবেলগুলোকে নষ্ট করে ফেলা। এ কারণেই এগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মে মাসের প্রথম দিকে আল-জাযীরা টেলিভিশনে একটি ভিডিও ফুটেজ প্রচার করা হয়, যাতে দেখানো হয় আমেরিকান সেনারা আলোচনা করছে আফগানদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। এ ভিডিও চিত্রে আরো দেখানো হয়, বাগরামে আমেরিকান বিমানঘাঁটিতে এক সামরিক ধর্মযাজক সেনাদের বাইবেল বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। বাইবেলগুলো আফগানিস্তানের প্রধান দু'টো স্থানীয় ভাষা পশতু ও দারিতে লেখা হয়েছিল। সামরিক ধর্মযাজক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল গ্যারি হেনসলি সেনাদের নছীহত করেছিলেন যে, যিশু খৃস্টের অনুসারী হিসাবে তাদের দায়িত্ব হ'ল, খৃষ্টের অনুসারীর সংখ্যা বাড়ানো। তিনি আরো বলেন, বিশেষ বাহিনীর লোকেরা যেমন মানুষ খুঁজে বের করে, আমরাও তেমন মানুষ খুঁজে আমাদের পথে (খৃষ্টান) নিয়ে আসব।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গর্ভাবস্থায় মায়ের বিষণ্ণতায় সন্তানও ভুগতে পারে

গর্ভাবস্থায় মা বিষণ্ণতায় ভুগলে তাঁর সন্তানের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। মা বিষণ্ণতায় ভুগলে পরবর্তী সময়ে জন্মের পর ঐ সন্তানের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং এক পর্যায়ে সন্তানটিও ভুগতে পারে বিষণ্ণতায়। অনিদ্রার সঙ্গে বিষণ্ণতার একটি যোগসূত্র রয়েছে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের এক গবেষণায় এ তথ্য জানা যায়। গবেষণায় জানা গেছে, বিষণ্ণতায় ভোগা মায়েদের শিশুরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম আট মাসে ঘুমের সমস্যায় ভুগতে পারে। এছাড়া তাদের জীবন-যাপনেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ধূমপায়ীরা অকালে দাঁত হারায় ও অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়

অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের জন্য আরেকটি দুসংবাদ হচ্ছে অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া এবং অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সার হওয়া। নতুন এক সমীক্ষায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন নামক একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে, যেসব ধূমপায়ী সব দাঁত হারিয়েছেন, তাদের অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা শতকরা ৬৩ ভাগ এবং যারা ১০টির কম দাঁত হারিয়েছেন তাদের এ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা মাত্র ৬ ভাগ। এক হাযার মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাতি!

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাতি তৈরী করেছেন লস অ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক। এটি এত ছোট যে, আলো না জ্বালালে খালি চোখে দেখা যায় না। এটির ফিলামেন্ট মাত্র ১০০ অ্যাটম প্রশস্ত, যা একটি কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে তৈরী। যখন এটি জ্বলে, খালি চোখে একটি আলোকবিন্দুর মতো দেখা যায়।

মৃত্যুর গন্ধ পায় পিঁপড়া

যখন কোন পিঁপড়া মারা যায়, তখন তার কোন এক সঙ্গী দ্রুত কলোনি থেকে দেহটা সরিয়ে ফেলে। এতে পিঁপড়া কলোনিতে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, পিঁপড়ারা কিভাবে টের পায় কলোনির কোন বাসিন্দা মারা গেছে? তত্ত্ব বলে, মৃত পিঁপড়া কোন রাসায়নিক সংকেত ছাড়ে, যা কলোনির জ্যান্ত পিঁপড়ারা টের পায়। কিন্তু আর্জেন্টাইন পিঁপড়া নিয়ে গবেষণা করা একদল কীটবিজ্ঞানী জানিয়েছেন, পিঁপড়াদের মৃত সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়ার কৌশল ভিন্ন। গবেষকরা বলেন, সব পিঁপড়া জ্যান্তই হোক আর মৃতই হোক, ক্রমাগত রাসায়নিক সংকেত দেয়। কিন্তু জ্যান্ত পিঁপড়াগুলো একটি বিশেষ রাসায়নিক বা 'লাইফ কেমিক্যাল' নিঃসরণ করে। যখন কোন পিঁপড়া মরে যায়, তখন তার দেহ থেকে এ রাসায়নিকের প্রভাব কমে যায়। এ থেকেই সঙ্গী পিঁপড়ারা মৃত্যু টের পায়।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

আসুন! জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলি

-আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ৮ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ঐতিহাসিক আব্দুর রাযযাক পার্কে যেলা সম্মেলন '০৯ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম আযীযুল্লাহ প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার মুজীবুর রহমান, সদর উপযেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ নযরুল ইসলাম ও পৌরসভার মেয়র শেখ আশরাফুল হক।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমি সাতক্ষীরার এক মযলূম সন্তান। ২০০৪ সালের ২৮ মে এই পার্কের জনসভায় ভাষণ দানের পাঁচ বছর পর আজ আবার আপনাদের সামনে আসতে পেরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। মাঝখানের দিনগুলিতে চার দলীয় জোট সরকারের চাপানো দেশের ৬টি যেলায় ১০টি মিথ্যা মামলা মাথায় নিয়ে ৭টি জেলখানায় ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতবাস শেষে গত বছর ২৮শে আগষ্ট আল্লাহ্‌র রহমতে মুক্তি পেয়েছি। এই দীর্ঘ বিরতিকালে সাতক্ষীরার যেসব আত্মীয়-স্বজন ও হিতাকাংখী ভাই-বোনকে আমরা হারিয়েছি, আমরা তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। যেসকল শুভাকাংখী ভাই ও বোন আমাদের মুক্তির জন্য দো'আ করেছেন, এখলাছের সাথে সহযোগিতা করেছেন, মিটিং-মিছিল-সমাবেশ ও জনসভা করে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, সাতক্ষীরার ১১ জন সহ বিভিন্ন যেলার কারা নির্যাতিত অন্যূন ৪০ জন নেতা-কর্মীর পক্ষ থেকে আমি তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কিন্তু বন্ধুগণ! একটি রূঢ় সত্য কথা এই যে, আমরা কোন অপরাধে কারা নির্যাতন ভোগ করেছি, তা আজও আমরা জানি না। আমাদের উপরে যারা যুলুম করেছেন এবং এখনও যারা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমাদের বিচারের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন, আখেরাতের কাঠগড়ায় একদিন তাদের সবাইকে দাঁড়াতে হবে। ইনশাআল্লাহ সেদিন আমরাই হব বাদী। বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। সেদিনের সূক্ষ্ম বিচারের আশায় থেকে দুনিয়ার কারু প্রতি আজ আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। নিশ্চয়ই এটি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঈমানী পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় খুশী থেকে ধৈর্যের সাথে জিততে পারলেই আশা করি জান্নাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বন্ধুগণ!

বিশ্বে যদি শান্তি কায়েম করতে হয়, তাহ'লে মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র কাছে ফিরে আসতে হবে। এদেশে যে রাজনীতি ও অর্থনীতি চলছে, তা বৃটিশের রেখে যাওয়া প্রতারণার রাজনীতি ও শোষণের অর্থনীতি। কূয়ায় মরা বিড়াল রেখে হাযারো পানি সেচেও যেমন পানি পরিষ্কার হয় না, পাশ্চাত্যের ঐসব শকুনী পদ্ধতি বহাল রেখে এদেশের সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। নির্বাচনের নামে পাঁচ বছর পর পর নেতা পাল্টানোর এই মরণ খেলা বন্ধ করতে হবে। সূদী অর্থনীতির স্যালাইন দিয়ে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে বাঁচানো যাবে না। বস্তুবাদের শয়তানী দর্শন মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় থেকে মুক্ত করে শয়তানের তাবেদার বানিয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্তম্ভ হ'ল তিনটি। বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন সভা। তন্মধ্যে আদালতের বিচারক ও যেলার প্রশাসক সরাসরি সরকারের মনোনয়নক্রমে হয়ে থাকেন। জনগণের ভোটের প্রয়োজন হয় না। অথচ আইনপ্রণেতা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনগণের হাতে। ফলে শুরু হয়েছে দলাদলি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সামাজিক হানাহানি। যেকারণে বাকী দু'টি স্তম্ভ বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগও প্রচণ্ড দলীয়তার প্রভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। তারা নিরপেক্ষ থাকতে পারছেন না।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হয়। জনগণ ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করবেন। অতঃপর তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করে দেশ চালাবেন। যতদিন তিনি আল্লাহভীরু ও যোগ্য থাকবেন, ততদিন তিনি নেতা থাকবেন। এভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া থাকে না। ফলে জাতি বিভক্ত ও পরস্পরে মারমুখী হয় না। লাগামহীন ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মালিকানাহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তথা প্রচলিত পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সততা, মেধা ও যোগ্যতার কারণে উঁচু-নীচু স্তরভেদ থাকবে। কিন্তু গাছতলা ও পাঁচতলার অন্যায় বৈষম্য থাকবে না। ধনী ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ও বাড়ী-গাড়ী গরীবের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হবে। দেহের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করবে। কিন্তু কোন স্থানে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে না। যেখানে মানুষ স্বার্থপর বস্তু সর্বস্ব হবে না ও সঞ্চয়ের নেশায় বুঁদ হবে না। বরং সর্বদা আল্লাহভীরু হবে ও তাঁর উপরে ভরসাকারী হবে। ভোগে নয়, ত্যাগে তৃপ্ত হবে।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। এটি কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছ হ'ল মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ পথ নির্দেশ। মানুষকে এই পথেই ফিরে আসতে হবে।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

Contents

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহীর নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্ব, খুলনার মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মানিকহার এলাকার প্রচার সম্পাদক মাওলানা বদরুযযামান, বাঁশদহা এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

উক্ত সম্মেলনে সাতক্ষীরার দুই কৃতি সন্তান ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও ডঃ মুহাম্মাদ আজিবর রহমান পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করায় যেলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র শেখ আশরাফুল হক। উল্লেখ্য যে, ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে ১৬ মাস হাজতবাস করে ৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে মুক্তি পান। ডঃ আজিবর রহমান 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি।

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফরের অন্যান্য খবর: ৭মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর রাজশাহী থেকে ট্রেনযোগে যশোর পৌছেন। সেখানে যশোর ও সাতক্ষীরা যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে কলারোয়ায় আন্দোলন-এর মাননীয় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ্র অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য রাত ১০-টার দিকে তার গ্রামের বাড়ী বালিয়াডাঙ্গা পৌঁছেন। এ সময়ে স্বর্তস্ফূর্তভাবে সমবেত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি মানব জীবনের সফরসূচী তুলে ধরে সকলকে আখেরাতের চূড়ান্ত ঠিকানার জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের আহ্বান জানান। অতঃপর রাত সাড়ে ১১-টায় আমীরে জামা'আত তাঁর একমাত্র বড় ভাই ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী জনাব আব্দুল্লাহ আল-বাকীকে দেখার জন্য সাতক্ষীরা ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালে গমন করেন। সেখান থেকে রাত সাড়ে ১২-টার দিকে তিনি জন্মস্থান বুলারাটি গ্রামে রোগ শয্যায় শায়িত তাঁর বড় বোনের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন ৮ মে শুক্রবার জুম'আর পূর্বক্ষণে আমীরে জামা'আত মাওলানা আকরাম খাঁর স্মৃতি বিজড়িত রসূলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ জনাব ওবায়দুল্লাহ খানকে দেখতে তার বাড়ীতে যান এবং তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। এ সময়ে মাওলানা আকরাম খাঁর নাতি সাবেক পৌর কমিশনার আদীলুযযামান খাঁন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি সাতক্ষীরা পৌর এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। জুম'আর সংক্ষিপ্ত খুৎবায় তিনি রসূলপুর গ্রামের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আমীরে জামা'আতের পিতার বন্ধু মরহুম আব্দুল গাফফার খান, মাওলানা আকরাম খাঁর জামাতা আব্দুল জাব্বার খান ও আব্দুল বারী খানের স্মৃতি চারণ করেন। খুৎবায় তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

বাদ জুম'আ 'আন্দোলন'-এর অন্যতম সুধী অসুস্থ মাষ্টার ইউনুস আলীকে দেখতে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন তার বাসায় যান এবং তার জন্য দো'আ করেন।

৯মে সকাল সাড়ে ১১-টায় আমীরে জামা'আত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও বুধহাটা এলাকার সাবেক সভাপতি সম্প্রতি মৃত মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীনের বাসায় যান এবং তার শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। সেখানে স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হান্নান সহ উপস্থিত বিপুল সংখ্যক সুধী সমাবেশে তিনি স্ব স্ব জীবনে নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি আলীমুদ্দীনের দুই কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করেন ও দো'আ করেন। তিনি তার ৮ বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে কোলে নিয়ে সমবেত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে বলেন, আলীমুদ্দীনের অসহায় স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনাদের হাতে সোপর্দ করে গেলাম। সবাই অশ্রুসজল চোখে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (৩৫) গত ২৩ এপ্রিল আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

একই দিন বিকাল ৫-টায় তিনি শহরের মুন্সিপাড়ায় 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম আ.ত.ম. ইমদাদুল হকের বাসায় গমন করেন এবং তাঁর পরিবারের খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর তিনি বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসায় গমন করেন এবং তাবলীগী ইজতেমা'০৯ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত অত্র মাদরাসার ছাত্র আখতারুল ইসলামের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর একই দুর্ঘটনায় নিহত বাঁকালের মুযাফফর ঢালি ও তাঁর স্ত্রীর বাড়ীতে গমন করেন ও তাঁদের সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করেন।

১০মে সকাল ৮-টায় তিনি সদর থানার মাহমূদপুর এলাকায় আন্দোলনের হিতাকাংখী মৃত আব্বাস আলীর বাড়ীতে যান এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সকাল ৯-টার কোচ যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঢাকার উদ্দেশ্যে সাতক্ষীরা ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দু'দিনের সাতক্ষীরা সফর ও ভাষণের খবর স্থানীয় দৈনিক গুলিতে দু'দিনেই প্রকাশিত হয়।

সুধী সমাবেশ

রাজশাহী ১৭ এপ্রিল শুক্রবার: অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারত-এর সভাকক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

Contents

মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এডভোকেট জারজিস আহমাদ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলী, দফতর সম্পাদক নাযিমুদ্দীন, সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদপুর এলাকার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মুসলিম, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সদস্য জনাব মতীউর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে দেড় শতাধিক সুধী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী, ১লা মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আহলেহাদীছ আন্দোলন রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ। নওদাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত সুধীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন (মধ্য নওদাপাড়া), আলহাজ্জ লুৎফুর রহমান (ওমরপুর), নযরুল ইসলাম (নওদাপাড়া), আব্দুল্লাহ আল-মামুন (নওদাপাড়া), আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার (বাগানপাড়া), জনাব ঈমান আলী (ভাড়ালীপাড়া), শামসুল হক মুহুরী (ওমরপুর) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক সুধী যোগদান করেন। নেতৃবৃন্দ সবাই সকল বাধার মোকাবেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে দ্বীনে হক্ব-এর নিরন্তর দাওয়াত সমাজের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। সেই সাথে ষড়যন্ত্রের চোরাগলি দিয়ে যেন কেউ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর নির্ভেজাল দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার এবং যেকোন ধরনের ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার ও সংগঠন বিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে সর্বদা সবাইকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।

ঢাকা, ১২মে মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, যেলা যুবসংঘের সভাপতি যহরুল হক যায়েদ, যুবসংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিগত দিনে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাধাসঙ্কুল ইতিহাস তুলে ধরে সমবেত সুধী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে যেকোন পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াত সর্বমহলে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া এলাকার দফতর সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বারী। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তামীলুল মিল্লাত মাদরাসা ও নাজিরা বাজার মাদরাসার ছাত্ররা যোগদান করেন। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আতের আবেগময়ী সারগর্ভ বক্তব্যে সকলের মধ্যে নতুন জেগে কর্মস্পৃহা জেগে ওঠে।

মেহেরপুর ২১ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার মুজিবনগর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় গোপালনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক **সুধী সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আযমতুল্লাহ মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন, 'যুবসংঘ' কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি তারীকুযযামান প্রমুখ।

গাইবান্ধা, ২৪ মে রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা যেলার শিমুলবাড়ী এলাকার উদ্যোগে শিমুলবাড়ী মারকাযের পার্শ্ববর্তী মাঠে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর স্থানীয় সুধী জনাব এমদাদুল হক বিএসসি, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহ আলী সরদার, বর্তমান চেয়ারম্যান দেলোওয়ার হোসাইন ও উপযেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হাদী প্রমুখ।

Contents

সমাবেশে বক্তাগণ কুয়েতী দাতা সংস্থার অর্থায়নে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্তৃক নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত শিমুলবাড়ী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা এবং জুম্মারবাড়ী 'নূরা জাহিম হাসপাতাল' এবং এসবের পরিচালনার জন্য ক্রয়কৃত ২৮ বিঘা ফসলী জমি রক্ষার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে সাঘাটা উপযেলাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, স্রেফ পরকালীন স্বার্থে বিদেশী দাতাগণের বিপুল অনুদানে গড়ে ওঠা এই মারকায ও হাসপাতাল কিছু লোকের কারণে যদি সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন দাতাগণের সম্মুখে আমাদের কৈফিয়ত দেওয়ার কিছুই থাকবে না।

দায়িত্বশীল বৈঠক

জয়পুরহাট, ২৬শে এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পলিকাদোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি, মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামকে সহ-সভাপতি ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নরসিংদী, ৭ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ। 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী ও স্থানীয় রসূলপুর ফাযিল মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা জালালুদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফীউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আমীর হামযা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ক্বাইয়ূম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন ও বর্তমান সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে সকল জড়তা কাটিয়ে উঠে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা, ৮ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ২২০ বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। বাদ মাগরিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘের বিপুল সংখ্যক কর্মীও যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' এবং ঢাবি যুবসংঘের কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রানবন্ত এই বৈঠকটি রাত ১০-টা পর্যন্ত চলে। দায়িত্বশীলদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রশিক্ষণ মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। তিনি কর্মীদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম তাঁর আবেগময় ভাষণে সাংগঠনিক জীবনের পরীক্ষার কথা তুলে ধরেন এবং নতুন উদ্যমে দ্বীনে হক্ব-এর এই দাওয়াত পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে আরো অধিক গতিশীলতার সাথে চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলকে সভাপতি, মোশাররফ হোসাইনকে সহ-সভাপতি ও তাসলীম সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

রংপুর ৮মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আবুল আব্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলাইডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ ছাদেক আলী, বর্তমান সভাপতি আব্দুস সালাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক তোফাযযল হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ। সমাবেশে আব্দুল ওয়ারেছকে সভাপতি ও ইকবাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে রংপুর যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

লালমণিরহাট ৯মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মহিষখোচা হাট আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আযহার আলী, সহ-সভাপতি রফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম, 'সোনামণি পরিচালক ইসরাঈল হোসায়েন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আযহার আলীকে সভাপতি ও আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠন করা যায়।

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ১৬ মে শনিবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পলাশবাড়ী মুহাম্মাদী জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক ও কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দফতর সম্পাদক মেসবাহুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহতাবুদ্দীন। অনুষ্ঠানে আবু হানীফকে সভাপতি ও সাইফুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা যুবসংঘের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

নওদাপাড়া মাদরাসা

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া থেকে অংশগ্রহণকারী ৭ জন ছাত্রের মধ্যে সকলেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জন 'এ+' এবং ৩ জন 'এ' গ্রেড অর্জন করেছে। তারা হ'ল-

সোহেল বিন আকবর	সিরাজগঞ্জ	এ+
আবু জা'ফর	রাজশাহী	এ+
আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ	বগুড়া	এ+
জুলফিকার আলী	নাটোর	এ+
যুবায়ের	সিরাজগঞ্জ	এ
আনোয়ারুল হক্ব	নাটোর	এ
মুকাম্মেল হোসেন	দিনাজপুর	এ

বাঁকাল মাদরাসা

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া, বাঁকাল, সাতক্ষীরা থেকে অংশগ্রহণকারী ৭ জন ছাত্রের সকলেই কৃতিত্বের সাথে 'এ+' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ জনই 'গোল্ডেন এ+' পেয়েছে। তারা হ'ল

আরীফুর রহমান	তালা, সাতক্ষীরা	এ+ (গোল্ডেন)
খালেদ মু'তাছিম বিল্লাহ	বুলারাটী, সাতক্ষীরা	এ+ (গোল্ডেন)
আব্দুল্লাহ আল-বাকী	বাগেরহাট	এ+ (গোল্ডেন)
আব্দুর রাযযাক	মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা	এ+ (গোল্ডেন)
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ	বাঁকাল, সাতক্ষীরা	এ+ (গোল্ডেন)
আব্দুল মতীন	খড়িবিলা, সাতক্ষীরা	এ+ (গোল্ডেন)
নাফীস আব্দুল্লাহ	খড়িবিলা, সাতক্ষীরা	এ+

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।
৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১) ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা ও কাফন-দাফন কীভাবে করতে হবে?

-গিয়াছুদ্দীন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বরই পাতা পানিতে দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং তার পরনের দুই কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন লোককে নিয়ে যাওয়া হ'ল, যার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়েছে। সে মুহরিম অবস্থায় মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দু'কাপড় দ্বারা কাফন দাও। আর মাথা খোলা রাখ। তবে তার পাশে খোশবু নিয়ে যেয়ো না' *(আবুদাঊদ হা/৩২৩৮, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম অবস্থায় মারা গেলে ইহরামের কাপড় দ্বারা তাকে কাফন দিতে হবে। মাথা ঢাকা যাবে না এবং খোশবু লাগানো যাবে না। উল্লেখ্য, বরই পাতার বদলে সাবান দিয়েও গোসল দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২/৩২২) কবর পাকা করা ও তার গায়ে ঠিকানা লেখা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম
ডুমনি, ঢাকা।

উত্তরঃ কবর পাকা করা এবং তার গায়ে কিছু লেখা যাবে না। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর সমাধি নির্মাণ করতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। তিনি কবরের গায়ে কিছু লিখতে এবং এর উপর হাঁটতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৯; সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৩)*। উল্লেখ্য যে, কবর পাকা করা এবং তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করাতে কবরবাসীর কোন লাভ নেই। যারা করছে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশকে অমান্য করছে এবং অপচয় করছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩) ৫০ বার কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করলে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসান
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ মর্মে একটি যঈফ হাদীছ রয়েছে। যেমন- 'যে ব্যক্তি ৫০ বার বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করবে সে পাপ থেকে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছেন *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭২৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪) রোগ-ব্যাধি ভাল করার উদ্দেশ্যে কিংবা দুনিয়াবী কোন মকছূদ হাছিলের জন্য কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং তাবীয দিয়ে টাকা-পয়সা নেয়া যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
দিনাজপুর সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে 'শিফা' বলেছেন। সে হিসাবে মুমিনের রোগ আরোগ্যের জন্য এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম মাধ্যম। তবে এটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা গর্হিত কাজ। কোন ছাহাবী ঝাড়-ফুঁক করাকে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তবে অবস্থাভেদে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমন একদল ছাহাবী একটি যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫)*। মানুষের কল্যাণের জন্য নেক-নিয়তে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে এবং এজন্য হাদিয়াও গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যার বিনিময় গ্রহণ কর কুরআন তার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৯০২)*।

কুরআন দ্বারা তাবীয করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। অতএব তাবীযের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, অবৈধ উদ্দেশ্য যেমন হারাম, কুরআন দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য হাছিল করাও তেমন হারাম।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫) 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাঁই ইয়াসীরা' দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে কখন বলতেন?

-আব্দুছ ছামাদ
নয়াপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে কখন বলতেন তা হাদীছে উল্লেখ নেই *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২. সনদ জাইয়িদ)*। তবে তিনি কুরআন পড়ার সময় আযাবের আয়াত আসলে আযাব হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতেন আর রহমতের আয়াত পড়লে রহমত চেয়ে নিতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/২৮৯)*। অতএব তিনি হিসাবের আয়াত আসলে অত্র দো'আটি পড়তেন। যেমন

Contents

আমরা সূরা গাশিয়ার শেষে পড়ে থাকি। তবে দো'আটি গাশিয়ার সাথে খাছ নয়। উল্লেখ্য, দো'আটি নীরবে পাঠ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬) জানাযার ছালাতে কি ছানা পড়তে হবে? সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
নীলফামারী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে একদা জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়লেন। তিনি সরবে আমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন আমি তাঁর হাত ধরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, এটাই সুন্নাত ও হক *(বুখারী, ১/১৭৮ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৩৩৫ অনুচ্ছেদ ৬৫; নাসাঈ হা/১৯৮৯; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮ 'জানাযা' অধ্যায়, ৭৭ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭) মাকড়সা নাকি শয়তান। আল্লাহ তার আকৃতি পরিবর্তন করে এরূপ করেছেন। এ মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-আব্দুল মুমিন
চককিত্তি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫১)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮) কাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলা হয়? তাঁদের বৈশিষ্ট্য কী?

-শফীক
কাঞ্চন, নরসিংদী।

উত্তরঃ যারা ছহীহ সুন্নাহকে শক্তভাবে গ্রহণ করে এবং ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার উপর দৃঢ় থাকে, তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَاوَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'হক-এর অনুসারী দলকেই জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারিখে দিমাস্ক ১৩/৩২২; মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯) কুনূতে নাযিলাহ কী? কখন পাঠ করতে হয়? জনৈক আলেম বলেছেন, প্রতিদিন ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আতে সিজদায় পাঠ করলে যালিমদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

-অধ্যক্ষ হাসান আলী
বসুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ বিপদের সময় নিজেদের জন্য কল্যাণ এবং শত্রুদের ধ্বংস কামনা করে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে হাত তুলে যে দো'আ করা হয় তাকে 'কুনূতে নাযিলা' বলে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কারো জন্য নেক দো'আ বা বদদো'আ করার ইচ্ছা করলে রুকূর পরে এ দো'আ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৯)*। অন্য হাদীছে এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই শেষ রাকা'আতে রুকূ থেকে উঠে পড়তেন। আর পিছনের মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*। অতএব কুনূতে নাযিলা পড়ার ব্যাপারে জনৈক আলেমের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০) অনেকেই বাড়ীর পাশে কিংবা মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য বলে থাকেন। কোন্ স্থানে কবর হওয়া ভাল?

-শরীফুল ইসলাম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে দাফন করাই সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী 'বাকী' নামক গোরস্থানেই দাফন করতেন *(মুসলিম ১/৩১৩)*। তবে নবী ও শহীদগণকে সে স্থানেই কবর দিতে হবে যেখানে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে *(তিরমিযী হা/১০১৮; আবুদাঊদ হা/৩১৬৫ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১) কা'বা ঘর তাওয়াফ করার ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফরোজা
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ৭ বার কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে'। এ সময় রুকনে ইয়ামানী ও 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করলে গুনাহ মিটে যায় *(নাসাঈ হা/২৯১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২) মৃত ব্যক্তিকে কবরে কীভাবে শোয়াতে হবে?

-ইসরাঈল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কবরে মৃতকে ডানকাতে কিবলামুখী করে শোয়াবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে অদ্যাবধি এরূপ আমলই হয়ে আসছে *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০২)*।

কবরে মাইয়েতকে কোন কাতে শোয়াতে হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ঘুমানোর সময়

ডানকাতে শোয়ার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৪-৮৫, 'দো'আসমূহ' অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)*। সম্ভবতঃ এর উপরে ভিত্তি করেই বিদ্বানগণ মাইয়েতকে ডান কাতে শোয়ানো এবং কিবলামুখী করার কথা বলেছেন *(আল-মুহাল্লা ৩/৪০৪, মাসআলা ৬১৫)*।

উল্লেখ্য, লাশ কবরে চিৎ করে রাখা, শুধু মুখটা ক্বিবলার দিকে করে দেয়া এবং তাকে মুছল্লী প্রমাণ করার জন্য হাত দু'টি বুকের উপর রাখা এগুলো ঠিক নয়। বরং দু'হাত দু'পাশে রাখাই ভাল। কারণ এটাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩) গোনাহগার মানুষের শাস্তি কখন থেকে শুরু হয়? মরণের পরে না ক্বিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পরে?

-আনোয়ার
হাসনের পাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ গোনাহগার মানুষের শাস্তি মরণের সময় থেকেই শুরু হয় *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব। অতঃপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' *(তওবাহ ৯/১০১)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এখানে 'অচিরেই শাস্তি দিব' অর্থ কবরের আযাব এবং 'অতঃপর কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' অর্থ পরকালে জাহান্নামের চূড়ান্ত শাস্তি বুঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আগুনের শাস্তি তাদের উপর পেশ করা হবে সকালে ও সন্ধ্যায়' *(মুমিন ৪০/৪৬; বুখারী ১/১৮৩)*। এতে স্পষ্ট হয় যে, শাস্তি কবর থেকেই শুরু হবে এবং চূড়ান্ত শাস্তি ক্বিয়ামতের পরে জাহান্নামে গিয়ে হবে। কবরে জিজ্ঞাসার উত্তর সঠিক না হ'লে কঠিন শাস্তি শুরু হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে?

-আব্দুল আহাদ
মুজগুন্নি, যশোর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে পায়ের দিক থেকে নামানো সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হারিছ (রাঃ)-কে পায়ের দিক থেকে কবরে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন এটিই হচ্ছে সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/৩২১১; বায়হাক্বী ৪/৫৪)*। তবে অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে। উল্লেখ্য যে, ক্বিবলার দিক থেকে কবরে নামানোর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী ৪/৫৪ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫) আমি আহলেহাদীছের পরিচয় জানতে চাই এবং সেভাবে নিজেকে গড়তে চাই।

-আমীরুল ইসলাম
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন। প্রশ্নকারীর কামনা আল্লাহ কবুল করুন আমীন!!

উল্লেখ্য, 'আহলেহাদীছ' কোন দল ও মতের নাম নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এক অনন্য বৈশিষ্ট্যগত নাম মাত্র। আহলেহাদীছের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন- 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বই এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (ডক্টরেট থিসিস)।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬) কা'বা ঘরে সব সময় তাওয়াফ ও ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আবুবকর সিদ্দীক্ব
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ কা'বা ঘরে সব সময় ত্বাওয়াফ ও ছালাত আদায় করা যাবে। জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন 'হে আবদে মানাফের সন্তানেরা! তোমরা রাত-দিন কোন সময়ে কা'বা ঘরে ছালাত আদায় করতে ও তাওয়াফ করতে লোকদেরকে নিষেধ কর না *(নাসাঈ হা/২৯২৪)*।

উল্লেখ্য, তিন সময়ে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা কা'বা গৃহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭) নেয়ামুল কুরআন বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পচবে না। (১) পয়গম্বর (২) শহীদ (৩) আলেম (৪) গাযী (৫) কুরআনের হাফেয (৫) মুওয়াযযিন (৭) সুবিচারক বাদশা বা সরদার (৮) সূতিকাগারে মৃত রমণী (৯) বিনা অপরাধে নিহত ব্যক্তি (১০) জুম'আর দিন যার মৃত্যু হয়। উক্ত কথাগুলো কি সঠিক?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
দিনাজপুর সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলো ঠিক নয়। তবে নবীগণের লাশ মাটিতে খায় না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৬১ 'জুম'আ' অধ্যায়)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮) নেশাদার দ্রব্য পানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবুব
সাতনী ঢেকড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সব অন্যায় করলে দুনিয়াতে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে নেশাদার দ্রব্য পান করা তার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নেশা পানকারীকে ৪০ দোররা মারতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১৪)*। ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে নেশা পানকারীকে ৪০ বেত্রাঘাত করতেন। কিন্তু শেষের দিকে ৮০ বেত্রাঘাত করতেন। কারণ তারা সীমা লংঘন করছিল এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্রেণীর মানুষের উপর জান্নাত হারাম বলেছেন। তার একশ্রেণীর মানুষ হচ্ছে- যারা নেশা পানকারী *(আহমাদ হা/৫১১৭; নাসাঈ, হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব যদি সে কাফের হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রঊফ
বামুন্দি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মুসলিম অমুসলিম যেকোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে দাফন করা আবশ্যক। আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু ত্বালেব মারা গেল তখন আমি নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, যাও তোমার পিতাকে মাটি চাপা দিয়ে এসো। অতঃপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আসবে। আলী (রাঃ) বললেন, আমি মাটি চাপা দিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও গোসল কর। তারপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আসবে। আমি গোসল করে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমার জন্য দো'আ করেন *(আবুদাঊদ হা/৩২১৪; নাসাঈ হা/২০০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামকরণ করা হ'ল কেন?

-মাহমূদুল হাসান
মহিষামুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ বিদ'আতী দলগুলো থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য হকপন্থী মুসলমানগণ প্রাথমিক যুগে 'আহলুলহাদীছ' হিসাবে পরিচিত হন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০, ২৮০)*। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, 'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনো হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল, আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। 'আহলে বিদ'আত' হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম, পৃঃ ১৫)*। 'আহলুল হাদীছ আন্দোলন' নামকরণের অর্থ এটা বুঝানো যে, এটি একটি দাওয়াতের নাম। মানুষকে পবিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে দাওয়াত দেওয়াই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০) জাদু করা ও দেখা কী ধরনের গোনাহ?

-আব্দুস সালাম
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ জাদু করা হারাম। জাদুকর হত্যার যোগ্য অপরাধী। ওমর (রাঃ) একদা বলেন, 'তোমরা জাদুকরদের হত্যা কর। ছাহাবীগণ বলেন, আমরা একদিনে তিনজন জাদুকরকে হত্যা করেছিলাম *(আবুদাঊদ হা/৩০৪৩)*। তবে ক্বিছাছ নেওয়ার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১) জানাযার সময় লাশকে সামনে রেখে তার প্রশংসা করা যায় কি?

-আব্দুল মান্নান
মহিষালবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাধারণভাবে মৃত মুমিনের গুণ বর্ণনা করা দোষনীয় নয়। কিন্তু মাইয়েতকে সামনে রেখে তার গুণ বর্ণনা করা এবং তিনি কেমন ছিলেন বলে উপস্থিত লোকদের কাছে মতামত নেওয়া নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এ কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ একটি জানাযা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তার গুণ বর্ণনা করলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর অন্য একটি জানাযা নিয়ে নবী কারীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা তার ব্যাপারে মন্দ কিছু বললেন, নবী কারীম (ছাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর বললেন, তোমরা একে অপরের জন্য সাক্ষী *(আবুদাঊদ হা/৩২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২) রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা ও সমস্যার সমাধান দেওয়া জায়েয কি?

-শামসুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা ও কোন সমস্যার সমাধান দেয়া জায়েয নয়। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেউ যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় দু'জনের মাঝে কোন বিচার ও ফায়ছালা না করে *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮৩)*। এটা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৩) মাসবূক যদি যোহর, আছর কিংবা মাগরিবের শেষ রাক'আত বা শেষের দু'রাক'আত পায় তাহ'লে পরবর্তী রাক'আতগুলোর ক্বিরাআত কেমন হবে?

-আছীরুদ্দীন
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসবূক ইমামের সাথে যা পায় তা তার ছালাতের প্রথমাংশ। অতএব এক রাক'আত পেলে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবে। আর বাকী রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় কর। আর যা ছুটে যাবে, তা পূর্ণ কর *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪) খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?

-আজীবর রহমান
হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে *(আবুদাঊদ হা/৫২০০ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৬৫০)*। খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫১০, ২/৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫) কবর থেকে লাশ বের করে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি?

-শরীফুল ইসলাম
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন সমস্যা মনে করলে বা যরূরী হ'লে কবর থেকে লাশ উঠিয়ে স্থানান্তর করা যেতে পারে। জাবির (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে একজন লোকের পাশে দাফন করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিল না। ফলে দাফনের ছয়মাস পর লাশ কবর থেকে বের করলাম। অতঃপর আমি তার কিছুই অপসন্দনীয় পেলাম না মাটির সাথে লাগা কয়েকটা দাড়ি ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/৩২৩২, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬) ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار– উক্ত আয়াতের শেষে দুনিয়ার শাস্তি, কবরের শাস্তি ও ক্বিয়ামতের শাস্তির কথা যোগ করা যাবে কি? যেমন- 'ওয়াক্বিনা আযাবাল ক্বাবরি', 'ওয়াক্বিনা আযাবাল আখিরাহ' ইত্যাদি।

-আহমাদ
নয়াপাড়া, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে ইহকালের সব ধরণের কল্যাণ চাওয়া হয়েছে এবং পরকালের সব ধরণের অকল্যাণ হ'তে মুক্তি চাওয়া হয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াতটি বেশী বেশী পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭)*। তাই এই আয়াতকে অসম্পূর্ণ মনে করে এর সাথে কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কুরআনের আয়াতের সাথে মানুষের কালাম যোগ করার সিদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭) সমাজে প্রচলিত আছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সবাই সমান। একথা কি সত্য?

-আবু সাঈদ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ একথা সত্য। যে ব্যক্তি অন্যায় করে ও যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না পাপের দিক দিয়ে উভয়ে সমান। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানে অবহেলাকারী এবং অন্যায়ে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন সম্প্রদায়ের ন্যায়, যারা একটি জাহাযে লটারীর মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। তদনুযায়ী কারো স্থান নীচের তলায় এবং কারো স্থান উপরের তলায় হল। আর নীচের লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের নিকট গমনাগমন করলে তাদের অসুবিধা ঘটে। তাই নীচের এক ব্যক্তি একখানা কুঠার নিল এবং জাহাযের তলা ছিদ্র করতে লাগল। এ সময় উপরের লোকেরা এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমাদের কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। অথচ আমাদেরও পানির একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় তারা যদি তার হস্তদ্বয় ধরে নেয়, তবে তাকেও রক্ষা করবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮ 'ন্যায়ের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অন্যায় রুখতে হবে। নইলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮) এসিড মারার অপরাধ কেমন? শরী'আতে এর শাস্তি কী?

-ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এসিড মারা মহা পাপ। এতে কেউ মারা গেলে তার ক্বিছাছ নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে ক্বিছাছের বিধান নির্ধারিত করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, দাস-এর বদলে দাস ও নারীর বদলে নারীকে হত্যা করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি এ গ্রন্থে

তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সেটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। আর যেসব লোক আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৪৫)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিছাছ বাস্তবায়ন করার বিষয়টি সরকারের দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯) আমাদের এলাকায় গৃহপালিত পশু-পাখি যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পায়ের নখ বা ক্ষুর তুলে সবই খেয়ে নেয়। এগুলো খাওয়া কি জায়েয?

-হাফিযুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলো হালাল প্রাণী। মানুষের যা রুচি হবে তা খাবে এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে হালাল প্রাণীকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা হয়েছে তা তোমরা খাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০) মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠিটি ছিল আদম (আঃ)-এর। তিনি জান্নাত থেকে আসার সময় জান্নাতের গাছের একটি ডাল নিয়ে এসেছিলেন। ডালটি আদম (আঃ) লাঠিরূপে ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবীগণের হাতে আসতে থাকে। শেষে মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে পৌঁছে। এ লাঠির অনেক মু'জিযা ছিল। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-ডাঃ খলীলুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লাঠির উপর ভর দেওয়া নবীদের স্বভাব, এ মর্মে জাল হাদীছ রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১) দেশে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে যোগ দেয়া যাবে কি? তারা কি রাসূলের পদ্ধতিতে তাবলীগ করে? নবী করীম (ছাঃ)-এর তাবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনতাজ
বাঁশকাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করে থাকে সে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাবলীগ করেননি। দ্বিতীয়তঃ তাদের বই 'তাবলীগী নেছাবে' অসংখ্য বানোয়াট ফযীলত অলীক গাল-গল্প এবং জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। তৃতীয়তঃ এরা মানুষকে 'নাহী আনিল মুনকার' তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ থেকে বিমুখ রাখেন। চতুর্থতঃ এরা মানুষকে ছহীহ হাদীছ মান্য করা থেকে বিরত রাখেন ও মিষ্টভাষায় তাদের অনুসারীদের বিদ'আতী বানান। পঞ্চমতঃ এরা তাদের আবিস্কৃত ছয় উছূলের বয়ানের মধ্যেই সীমায়িত থাকেন। ইসলামের অন্যান্য বিষয় থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখেন। ষষ্ঠতঃ তাদের চালুকৃত চিল্লা প্রথার মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের সাংসারিক ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। অথচ মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব হ'ল তার নফসের ও তার পরিবারের *(তাহরীম ৬)*। সপ্তমতঃ তারা অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যান।

তাবলীগের সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অভিজ্ঞ মুমিন ব্যক্তি মসজিদ ভিত্তিক অথবা অন্য যেকোন সুন্দর উপায়ে সর্বদা দ্বীন প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তাবলীগের মূলনীতি হ'ল, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। যা কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে হ'তে হবে *(মায়েদাহ ৬৭; ইউসুফ ১০৮)*। তাবলীগ একাকীও হ'তে পারে, জামা'আতবদ্ধ ভাবেও হ'তে পারে *(তওবাহ ৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২) নাজী ফের্কা সম্পর্কিত হাদীছটির সারমর্ম জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নাজী ফের্কা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَيَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَلَوْلاَ هُمْ لَمْ نَجِدْ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ.

'উক্ত দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। যারা রাসূলের বিধান সমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইলম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহ্মিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না' *(খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫)*।

ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِيْ مَنْ هُمْ؟ 'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা: ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা;*

সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ, পৃঃ ১৫)। ‘ইমাম বুখারীও এ বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন’।

ক্বাযী আয়ায বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ‘ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করেন, তাদেরকে বুঝিয়েছেন’ *(ফাৎহুল বারী ‘ইল্‌ম’ অধ্যায় ১/১৯৮, হা/৭১-এর ব্যাখ্যা)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِىْ خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لاَيَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ ‘আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না’ *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৭)*।

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا-

‘যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে জীবন্ত দেখি’ *(শারফ ২৬)*।

খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন,

هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَقَالَ: أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ-

‘নাজী দল হ’ল আহলেহাদীছ জামা‘আত’। ... ‘লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়’ *(শারফ ১৫, ৩৩)*। উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। রক্ত, বংশ, নাম ও পদমর্যাদার মধ্যে নয়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে দলকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে?

-হাবীবুর রহমান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জান্নাতী দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর আছে সেই পথে যারা থাকবে তারাই জান্নাতী’ *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭১)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আক্বীদা, আমল, চরিত্র ও মূলনীতির সাথে যাদের মিল পাওয়া যাবে তারাই জান্নাতী দল। জান্নাতী দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শায়খ উছাইমীন বলেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর (১) আক্বীদা (২) ইবাদত (৩) আখলাক ও (৪) মু‘আমালাতকে শক্তভাবে গ্রহণ করে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আক্বীদা অর্থঃ (ক) প্রতিপালককে এক মানা। (খ) মাবূদকে এক জেনে তাঁর ইবাদত করা (গ) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, অর্থাৎ তাওহীদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ও একমুখি হওয়া। ইবাদত অর্থঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন মানার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিদ‘আত পাওয়া যাবে না। ইবাদতের মধ্যে কোন নতুন ইবাদত প্রবেশ না করতে দেয়ার ব্যাপারে তারা অটল। তারা রাসূলের শিষ্টাচার মানার ব্যাপারে কোন ইমাম বা বুযর্গকে প্রাধান্য দেবে না। আখলাক্ব অর্থ: হাসি মুখে সুন্দর কথা বলা, মন পরিস্কার ও প্রশস্ত রাখা ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে তারা সবার চেয়ে ভিন্ন ও সুন্দর। মু‘আমালাত হ’লঃ তারা মানুষের সাথে লেন দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও সত্যবাদী *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২২-২৫)*।

আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ’ল এই যে, তারা হলেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোসহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ‘আতের বিরুদ্ধে আপোসহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ বাপের সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন ভেদাভেদ নেই। বরং যেকোন মুসলমান নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ’লেই কেবল তিনি ‘আহলেহাদীছ’ নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৮)*।

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ’তে তারা বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাত সমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু‘উদ ইত্যাদি আরকানগুলোকে ধীরে-সুস্থে শান্তির সঙ্গে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এতদ্ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে তারা মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ‘আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ‘আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না।

Contents

তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন, যাতে তাদের বাতিল যুক্তি সমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে' *(আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯৯-১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪) কত সালে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন?

-ফয়েয
ধামতি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত মাযহাবী তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম নির্দিষ্টভাবে কোন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২)*। 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থে তিনি বলেন, বনী উমাইয়াদের শাসনের অবসান কাল (১৩২ হিঃ) পর্যন্ত কোন মুসলিম নিজেকে হানাফী, শাফেঈ ইত্যাদি বলতেন না। আব্বাসীয় শাসনামলে ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতি হ'লে তাঁর মাধ্যমে হানাফী মাযহাব প্রসার লাভ করে *(ফওয়ায়েদুল বাহিইয়াহ, পৃঃ ৯৪; হুজ্জাতুল্লাহ ১/১৪৬ পৃঃ; মুক্বাদ্দামা শারহে বেক্বায়াহ, পৃঃ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫) মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো আদায় করার সময় তাকবীর ও ক্বিরাআত সরবে আদায় করবে না নীরবে আদায় করবে?

-সাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাকবীর ও ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় কর এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ কর *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬ 'ছালাত' অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)*। এখানে বুঝা যায় যে, বাকী ছালাতও একই পদ্ধতিতে আদায় করবে *(মালেক, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৮৭)*। তবে মাসবূক সংখ্যায় বেশী হ'লে এবং তারা পৃথক পৃথকভাবে ছালাত আদায় করলে নীরবে পড়াই ভাল। কারণ সবাই সরবে পড়লে ছালাতে খুশূ-খুযূ নষ্ট হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬) জনৈক ব্যক্তি বলেন, পাগড়ী পরার ফযীলত অনেক। অতএব টুপি পরা সুন্নাত হলে পাগড়ী পরা ফরয হবে। বিষয়টি জানতে চাই।

- মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পাগড়ী পরার ব্যাপারে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুসলিম হা/৩১৭১, ৩১৭৫, ৩১৭৬, ৩১৭৭; আবুদাঊদ হা/৪০৭৬; ইবনে মাজাহ ২৮২২)*। কিন্তু পাগড়ী পরিধানের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীছ রয়েছে সবগুলোই জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-২৮)*।

নবী কারীম (ছাঃ) টুপি পরিধান করতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ *(যঈফুল জামে হা/৪৬২২-২৪, ২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩১৩)*। তবে টুপী পরিধান করা সেযুগের রীতি ছিল এবং ছাহাবীগণ টুপী পরিধান করতেন বলে হাদীছে এসেছে। যেমন (১) সুফিয়ান ইবনু ওয়ায়না বলেন, আমি শারীককে দেখলাম আমাদেরকে জানাযার পরে আছর পড়ালেন এবং তাঁর টুপীটি সম্মুখে রাখলেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, ১০৪ অনুচ্ছেদ)*। (২) ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহ বুখারীর *(হা/১১৪০)* তারজুমাতুল বাবে *('ছালাতের মধ্যে কাজ করার অনুচ্ছেদ সমূহ')* তা'লীক্ব হিসাবে উদ্ধৃত করেন, 'আবু ইসহাক ছালাতের মধ্যে তাঁর টুপী মাটিতে রাখলেন ও পুনরায় উঠালেন'। উল্লেখ্য যে, টুপী হ'ল শিষ্টাচারমূলক পোষাকের অন্তর্ভুক্ত, এটি ইবাদাতের অন্ত র্ভুক্ত নয়। এটাকে তাক্বওয়ার পোশাক হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭) ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি কীভাবে হয়?

-মোখলেছুর রহমান
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহ্র কথা বলা হ'লে ভয়ে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। যখন তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রভুর উপরে তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয় *(আনফাল ৮/২-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১; তাওবা ৯/১২৪-১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হ'ল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫)*।

আল্লাহ্র পরিচিতি এবং তাঁর গুণগত নামের পরিচয় বেশী জ্ঞাত হ'লে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র নির্দশনাবলীতে দৃষ্টি দিলে ঈমান বেশী হয় *(যারিয়াত ২০)*। ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জে যত আনুগত্য বেশী হবে ঈমান তত বেশী হবে। অপর দিকে আল্লাহ্র পরিচয়ে যে পরিমাণ অজ্ঞতা থাকবে, ঈমানে তেমনি ঘাটতি থাকবে। মানুষের নাফরমানী অনুযায়ী ঈমানে কমতি আসবে। আনুগত্য কম হ'লে ঈমান কমে যাবে এবং বেশী হ'লে ঈমান বৃদ্ধি পাবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৮-৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮) শহীদ কে? কোন কোন শ্রেণীর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের শহীদ বলা যায়?

-ইমাসাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে যিনি নিহত হন তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শহীদ। তবে আরও কয়েক শ্রেণীর মুমিন শহীদের মর্যাদা পাবেন। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেন, 'তোমরা কাকে শহীদ গণ্য কর? তারা বললেন, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় সেই শহীদ। তখন তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা তাতে অতি নগন্যই হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত থেকে মারা যায় সেও শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সেও শহীদ এবং যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায় সেও শহীদ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯) জনৈক বক্তা বলেন, ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে গেলে যে রক্ত বের হয়েছিল সেই রক্ত ছাহাবীগণ পান করেছিলেন। মাটিতে পড়তে দেননি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-দিদার বক্স
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়; বরং বানোয়াট। কারণ প্রবাহিত রক্তকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০) ইমাম-মুক্তাদী মিলে সরবে তিনবার আমীন বলার কোন দলীল আছে কি?

-আবদুল আউয়াল
নয়াপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ তিনবার আমীন বলার প্রমাণে ত্বাবারাণী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ত্বাবারানী হা/১৭৫০৭; তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৯৩-৯৪)*। অতএব ছালাতে তিনবার আমীন বলা ঠিক নয়।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

এতদ্বারা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' জানুয়ারী '০৮ থেকে নতুন ডাক মাশুল নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের ডাক মাশুলের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী। সেকারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।